T
69

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক মধ্য ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহের
পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে অনুমোদিত বিজ্ঞপ্তি নং ১০ টি. বি.
কলিকাতা গেজেট ১ ।১২।৫৫ তারিখ দ্রষ্টব্য।

আমাদের ভারত

(পঞ্চম শ্রেণীর জন্য)

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE. BANIPUR.
3842

শিশু সাহিত্যিক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীঅজিত কুমার সরকার

S.C.E.R.T. West Bengal Library

মেদিনীপুর বুক ডিপো
২৭২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সংশোধিত সংস্করণ—১৩৬২

LIBRARY

মূল্য—১।০

মেদিনীপুর বুক ডিপোর পক্ষে শ্রীঅজিত কুমার সরকার ২১২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস, ২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীগৌরচন্দ্র পাল কর্তৃক মুদ্রিত।

377
3882
SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE MANIPUR

সূচীপত্র

C.E.R.T. W.B. LIBRARY
Dt.
Accn. No.

3882
SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE BARUIPUR

আমাদের ভারত

প্রথম অধ্যায়

কথারম্ভ—"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য,
হেথায় দ্রাবিড়, চীন,
শক হূণদল, পাঠান, মোগল,
এক দেহে হলো লীন।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি মর্মে মর্মে সত্য। বিশাল ও বিচিত্র দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। মানবেতিহাসের আদিম উষাকালে নবোদিত সভ্যতার আলোকচ্ছটায় পৃথিবীর যে কয়েকটি দেশ রঞ্জিত হয়েছিল, ভারতবর্ষ তাদের মধ্যে অন্যতম। ভারতভূমি স্বর্ণপ্রসূ। তার এই খ্যাতি চিরদিন পৃথিবীর নানা-জাতির লোকের মনোহরণ করেছে। তাই তার ঐশ্বর্যের আকর্ষণে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির লোক ভারতবর্ষে ছুটে এসেছে। কেউ ধনরত্ন লুণ্ঠন ক'রে নিজেদের দেশে ফিরে গেছে। কিন্তু অনেকেই শেষ পর্যন্ত রয়ে গেছে এবং ভারতবর্ষকে স্বদেশ ব'লে

মেনে নিয়েছে। এইভাবে নানা জাতি ও নানা ভাষাভাষী লোকের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে এই বিশাল ও বিচিত্র দেশ ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষের বুকে এই নানা জাতির আগমন ও উত্থান-পতনের কাহিনী নিয়েই ভারতবর্ষের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের ধারা বেয়েই আমাদের উদ্ভব এবং প্রায় দু'শো বছরের পরাধীনতার পর আবার আমরা স্বাধীন হয়েছি।

হিন্দু রাজত্বের অবসানের পর ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন আরম্ভ হয়। সে এখন থেকে প্রায় সাড়ে সাত শ' বছর আগেকার কথা। সেই সময় যাঁরা ভারতবর্ষে এসে রাজ্য জয় করেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন তুর্কী; কেউ কেউ ছিলেন আফগান। এই রাজাদের উপাধি ছিল 'সুলতান'। তাই কুতুবউদ্দিনের আমল থেকে যে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত হয় তাকে 'সুলতানী শাসন' বলা হয়ে থাকে। সুলতানি শাসন প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর স্থায়ী হয়েছিল। দিল্লীর সুলতান যখন ইব্রাহিম লোদী, তখন কাবুল থেকে **বাবর** নামে একজন দুঃসাহসী বীর তাঁকে পরাজিত ক'রে দিল্লী দখল করেন। এই সময় থেকে ভারতবর্ষে পাঠন রাজত্বের অবসান হয়ে মোগল শাসন আরম্ভ হয়। মোগল শাসন আমল থেকেই এই ইতিহাসের কাহিনী শুরু।

বাবর ও দিল্লীর সুলতানির অবসান

প্রায় সাড়ে চার শ' বছর আগে মধ্য এশিয়ায় **ফরঘনা** নামে একটি ছোট রাজ্য ছিল। এই রাজ্যে তুর্কীজাতীয় মুসলমান

সুলতানেরা রাজত্ব করতেন। ফরঘনার সুলতান ওমর শেখ মীর্জার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **বাবর** মাত্র বারো বছর বয়সে ঐ রাজ্যের রাজা হন। বাবরের পিতা ছিলেন তুর্কী এবং তৈমুর-লঙ্‌য়ের বংশধর, কিন্তু মাতা ছিলেন দিগ্বিজয়ী মোগল বীর চেঙ্গিস খাঁর বংশের কন্যা। বাবরের মায়ের বংশের নামানুযায়ী তাঁকে ও তাঁর বংশধরগণকে **মোগল** বলা হয়ে থাকে।

বাবরের প্রকৃত নাম ছিল জহীরউদ্দিন মোহাম্মদ। তুর্কী ভাষায় 'বাবুর' শব্দের অর্থ হলো 'সিংহ বা ব্যাঘ্র'। জহীরউদ্দিন অল্প বয়সে অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন ব'লে পরবর্তীকালে ইতিহাসে তিনি 'বাবুর' বা 'বাবর' নামে পরিচিত হন।

প্রথম জীবন—রাজার ছেলে হলেও বাবরের বাল্যকাল সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটতে পারেনি। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতিরা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করতে আরম্ভ করে। বালক বাবর জ্ঞাতি-শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠলেন না ; তাঁকে রাজ্য হারিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে হলো। কিন্তু তিনি মনে মনে নিরাশ হলেন না। দ্বিগুণ উদ্যমে সৈন্য সংগ্রহ ক'রে কিছুদিনের মধ্যে নিজের রাজ্য ও মধ্য এশিয়ার প্রসিদ্ধ নগর তৈমুরলঙ্‌য়ের রাজধানী সমরকন্দ অধিকার ক'রে নিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উজবেকদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পারায় ফরঘনা ও সমরকন্দ তাঁর হস্তচ্যুত হলো। এমন দুঃসময়েও রাজ্যহারা তরুণ বাবর নিজের উপরে বিশ্বাস হারালেন না। অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের বলে তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যে

কাবুল অধিকার করলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে গজনী এবং কান্দাহারও তাঁর অধিকারে এসে গেল। এইভাবে বাবর প্রায় সমগ্র আফগানিস্তানের অধিপতি হয়ে বসলেন।

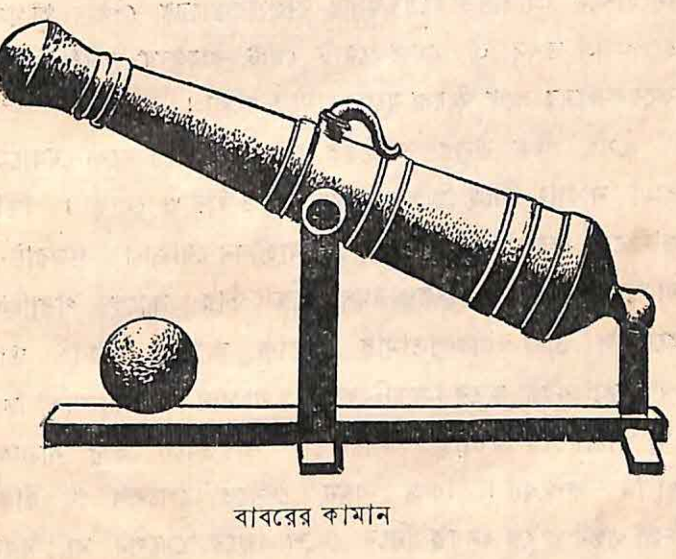
ভারতে আগমন—ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তান। বাবর ভারতবর্ষের ধনরত্নের সম্বন্ধে নানাপ্রকার গল্প শুনেছিলেন। বহুদিন থেকেই তাঁর মনে এদেশ জয়ের স্বপ্ন জাগে। কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেই স্বপ্ন তাঁর দৃঢ় ইচ্ছায় পরিণত হলো। তিনি সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন।



সম্রাট্ বাবর

দিল্লীতে তখন সুলতান ইব্রাহিম লোদীর রাজত্ব। **ইব্রাহিম লোদী** ছিলেন দুর্বল অথচ অত্যন্ত অহঙ্কারী। তাঁর ব্যবহারে বড়বড় আমীর-ওমরাহ্‌গণ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন; এমন কি তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা পর্যন্ত তাঁকে ভালো চোখে দেখতেন না। তাঁর অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্তারা তাঁর সুলতানির অবসান কামনা করছিলেন। বিশেষতঃ

পাঞ্জাবের শাসনকর্তা **দৌলত খাঁ লোদী** তাঁকে একান্ত ঘৃণা করতেন। তিনি ইব্রাহিম লোদীকে জব্দ করবার উদ্দেশ্যে বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণে আহ্বান জানালেন। বাবর এই সুযোগ উপেক্ষা করলেন না। তিনি বহু সৈন্য-সামন্ত ও কামান-বন্দুক নিয়ে দিল্লী আক্রমণ করলেন। **পানিপথ** নামে এক জায়গায় বাবরের সঙ্গে ইব্রাহিম লোদীর ঘোরতর যুদ্ধ হলো। ইব্রাহিম লোদীর সৈন্য-সংখ্যা বাবরের তুলনায় অনেক বেশী থাকলেও তাঁর



বাবরের কামান

কোন কামান ছিল না; তাই ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যেরা বাবরের কামানের গোলার মুখে টিঁকতে পারল না। যুদ্ধে বাবরের জয় হলো; ইব্রাহিম যুদ্ধে মারা গেলেন। এই যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে **পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ** নামে পরিচিত।

এই যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে সুলতানি শাসনের অবসান হয়ে মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হলো।

রাজ্য-বিস্তার—পূর্বপুরুষদের মত দিল্লী লুণ্ঠন করা বাবরের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করা। পাণিপথের যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করলেন। উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তখন বিভিন্ন পাঠান দলপতি ও হিন্দুরাজগণও রাজত্ব করছিলেন। দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাবর রাজ্যবিস্তারের চেষ্টায় অগ্রসর হলেন। তখন ঐ সমস্ত ছোট ছোট রাজ্যের অধিপতিদের কয়েকজনের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধে নামতে হলো।

সেই সময় উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাদের মধ্যে মেবারের রানা **সংগ্রাম সিংহ** ছিলেন সবচেয়ে বড় বীর ও যোদ্ধা। তিনি জাতিতে ছিলেন রাজপুত এবং আজীবন যোদ্ধা। গুজরাট ও মালবের মুসলমান সুলতানগণ যুদ্ধে তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিল এবং রাজপুতানার অন্যান্য অনেক রাজাও তাঁর অধীনতা বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। সংগ্রাম সিংহের আশা ছিল যে, পাঠানদের বিতাড়িত ক'রে তিনি ভারতবর্ষে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করবেন। কিন্তু যখন দেখতে পেলেন যে বাবর দিল্লী লুণ্ঠন ক'রে ধনরত্ন নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন না, বরঞ্চ স্থায়িভাবে এদেশে রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হয়েছেন, তখন তাঁর সে স্বপ্নে আঘাত লাগল। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে বাবরকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন। রাজপুতানার অন্যান্য

কয়েকজন রাজা সংগ্রাম সিংহের পক্ষে যোগদান করলেন। আগ্রার নিকটবর্তী **খানুয়ার** বিস্তৃত প্রান্তরে বাবর ও সংগ্রাম সিংহের মধ্যে যুদ্ধ বেধে উঠল। সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে রাজপুত যোদ্ধারা অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করল; কিন্তু বাবরের শক্তির



সঙ্গে পেরে উঠল না। শেষ পর্যন্ত বাবরই জয়ী হলেন। পরাজয়ে সংগ্রাম সিংহ মর্মান্তিক আঘাত পেলেন। তাই এই যুদ্ধের অল্পদিন পরেই তাঁর অকালমৃত্যু হলো।

খানুয়ার যুদ্ধের পর বাবর মাত্র তিন বছর বেঁচে ছিলেন। এরই মধ্যে তিনি উত্তর ভারতের অনেক অংশ জয় ক'রে নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা **মাহ্‌মুদ লোদী**

বিহারের পাঠান ওমরাহ্‌দের ঐক্যবদ্ধ ক'রে আবার সুলতানি শাসন ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বিহারী পাটানগণ বাবরের কাছে পরাজিত হতে বাধ্য হয়।

বাবরের মৃত্যু—ভারতবর্ষে মাত্র চার বছর রাজত্ব করবার পর বাবরের মৃত্যু হয়। বাবরের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। বাবরের পুত্র হুমায়ুন তখন কঠিন রোগে আক্রান্ত, তাঁর জীবনসংশয় অবস্থা। এই সময় একজন দরবেশ বললেন যে বাবর যদি তাঁর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে পারেন তা' হলে তাঁর পুত্রের জীবন রক্ষা হতে পারে। এই শুনে বাবর এক মনে আল্লাহ্‌কে ডাকতে লাগলেন এবং বললেন—"আমার কাছে আমার জীবনের চেয়ে মূল্যবান বস্তু আর কী থাকতে পারে? খোদা, তুমি তাই নিয়ে আমার পুত্রের জীবন ফিরিয়ে দাও।" এর পর হুমায়ুন ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে লাগলেন এবং বাবর দিন দিন মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এইভাবে শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হলো।

চরিত্র—বাবরের মত অধ্যবসায়ী, গুণবান ও দৃঢ়চেতা বীর খুব কমই ভারতবর্ষের সিংহাসনে বসেছেন। সারা জীবন তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রে ও ভাগ্য প্রতিষ্ঠায় কাটলেও তিনি অবসর পেলেই লেখাপড়ার চর্চা করতেন। তিনি ফরাসী ভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করতে পারতেন। তিনি তুর্কী ভাষায় নিজের জীবন-চরিত লিখে রেখে গেছেন। বাবর নিষ্ঠাবান মুসলমান, দৃঢ়চেতা যোদ্ধা ও স্নেহপ্রবণ পিতা ছিলেন। তিনি যাদের সঙ্গে মিশতেন,

সহজেই তাদের আপন ক'রে নিতে পারতেন। ছোট বেলা থেকেই এই গুণ তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। অনুগত ভক্তদের তিনি আপন ভাইয়ের মত ভালোবাসতেন। তাই একান্ত বিপদের মধ্যেও তিনি কখনো মনোবল হারাননি। তাঁর জীবজন্তু পোষা ও বাগান করবার সখ ছিল।

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ কাবুলে পাঠিয়ে সেখানে কবরস্থ করা হয়। বহুকাল পরে সম্রাট্ শাহ্‌জাহান সেই কবরের উপরে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE

মনে রেখো

—১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে—বাবরের জন্ম
—১৪৯৪ ,, —বাবরের পিতৃবিয়োগ ও রাজ্যলাভ
—১৫২৬ ,, —পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ; ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন
—১৫২৭ ,, —খানুয়ার যুদ্ধ
—১৫৩০ ,, —বাবরের মৃত্যু

অনুশীলনী

১। বাবরের প্রথন জীবন সম্বন্ধে যা' জান লিখ।
২। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের কারণ কী?
৩। সংগ্রাম সিংহ কে ছিলেন? তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিল?
৪। বাবরের মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী সংক্ষেপে বল?
৫। বাবরের চরিত্রে কী কী গুণ ছিল?

দ্বিতীয় অধ্যায়

শের শাহ্

বাবরের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র হুমায়ুন। কিন্তু সিংহাসনে বসে তিনি বেশীদিন নির্বিঘ্নে রাজত্ব করতে পারলেন না। তখন ভারতে পাঠানশক্তি পরাজিত হলেও একেবারে নির্মূল হয়নি। এখানে সেখানে ছোটখাট রাজ্য আগলে বসে পাঠান দলপতিগণ শাসন চালাচ্ছিলেন। তাঁদের মনে তখনও পাঠান সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন জাগ্রত ছিল। এই সমস্ত পাঠান দলপতিদের মধ্যে **শের খাঁ** ছিলেন বিশেষ শক্তিশালী।



শের শাহ্

প্রথম জীবন—শের খাঁ ছিলেন শূরবংশীয় আফগান বা পাঠান। তাঁর আসল নাম ছিল **ফরিদ খাঁ**। তাঁর পিতা হাসান খাঁ শূর ছিলেন বিহারের অন্তর্গত সাসারামের একজন জায়গীরদার। বিমাতার চক্রান্তে ফরিদকে অতি অল্প বয়সেই বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। প্রথমে তিনি জৌনপুরে যান। সেখানে তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন। তারপর তিনি বিহারের

শাসনকর্তার অধীনে একটি চাকুরি পেয়ে গেলেন। এই সময়ে একদিন ফরিদ তলোয়ারের এক আঘাতে একটি 'শের' বা বাঘ মারেন। তখন থেকে তিনি 'শের খাঁ' নামে পরিচিত হন।

পিতার মৃত্যুর পর শের খাঁ পৈত্রিক জায়গীরের শাসন-ক্ষমতা লাভ করলেন। কিন্তু জ্ঞাতিশত্রুর চক্রান্তের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে সে জায়গীর হারাতে হলো। তখন তিনি বিহারের পাঠান সুলতানের নাবালক পুত্র জালাল খাঁর শিক্ষকতার কাজ পেলেন। কিছুদিন এই কাজ করবার পর তিনি মোগল সম্রাট্ বাবরের অধীনে একটি কাজ গ্রহণ করলেন। তারপর তাঁরই অনুগ্রহে ও সহায়তার শের খাঁ জ্ঞাতি-শত্রুদের হাত থেকে আবার পৈত্রিক জায়গীর উদ্ধার করলেন। এর মধ্যে তিনি বাবরের দরবার থেকে কর্মচ্যুত হয়ে বিহারে ফিরে আসেন। তাঁর পূর্বতন ছাত্র জালাল খাঁ তখন বিহারের সুলতান। শের খাঁ নাবালক সুলতানের অভিভাবক নিযুক্ত হলেন। কিন্তু এবারও তাঁকে শত্রুদের চক্রান্তে পড়তে হলো। বিহারের ওমরাহ্‌গণ তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্তিতে ঈর্ষান্বিত হলেন। তখন বাংলার সুলতান ছিলেন গিয়াস্‌উদ্দিন মামুদ। তাঁরা জালালকে সঙ্গে নিয়ে গিয়াস্‌উদ্দীনের সঙ্গে মিলিত হয়ে শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। বাংলা ও বিহারের দুই সুলতানের সম্মিলিত সৈন্যদল শের খাঁর কাছে পরাজিত হলো। ফলে শের খাঁ বিহারের স্বাধীন সুলতান হলেন। তখন তিনি রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হয়ে বাংলার রাজধানী গৌড় আক্রমণ করলেন। বাংলার সুলতান তাঁকে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে গৌড়কে মুক্ত করলেন।

হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধ—শের খাঁ যখন পূর্বভারতে পাঠান রাজ্য স্থাপনে ব্যস্ত, মোগলসম্রাট হুমায়ুন তখন পশ্চিম ভারতে গুজরাটের সুলতান **বাহাদুর শাহের** সঙ্গে যুদ্ধে রত। হুমায়ুন শের খাঁর শক্তিবৃদ্ধিতে ক্রমশঃ চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং তাঁকে দমন করবার উদ্দেশ্যে গুজরাট ছেড়ে পূর্বদিকে রওনা হলেন। বিহারে ও বাংলা দেশে মোগল বাহিনী কিছুদিন যাবৎ শের খাঁর প্রতীক্ষায় রইল কিন্তু কোন ফল হলো না। শের খাঁ কিছুতেই হুমায়ুনের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে উপস্থিত হলেন না। তিনি মোগল বাহিনীর পাশ কাটিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে দুর্গম রোটাস দুর্গ ও বারাণসী জয় করলেন। এই সংবাদ জানতে পেরে হুমায়ুন সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলা দেশ থেকে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন। পথে বক্সারের নিকটবর্তী **চৌসা** নামক জায়গায় শের খাঁ অতর্কিতে মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। আকস্মিক আক্রমণে হুমায়ুন বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। যুদ্ধে শের খাঁর জয় হলো। হুমায়ুন এক ভিস্তিওয়ালার সাহায্যে কোনমতে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলেন। পরের বছর কনৌজের কাছে বিলগ্রামের যুদ্ধে আবার হুমায়ুন পরাজিত হলেন। দিল্লীর মসনদ ছেড়ে তাঁকে সপরিবারে পলায়ন করতে হলো।



হুমায়ুন

শের খাঁ তখন **শের শাহ্** উপাধি ধারণ ক'রে দিল্লীর বাদশাহ্ হলেন। ভারতে আবার পাঠান রাজত্বের সূচনা দেখা দিল।

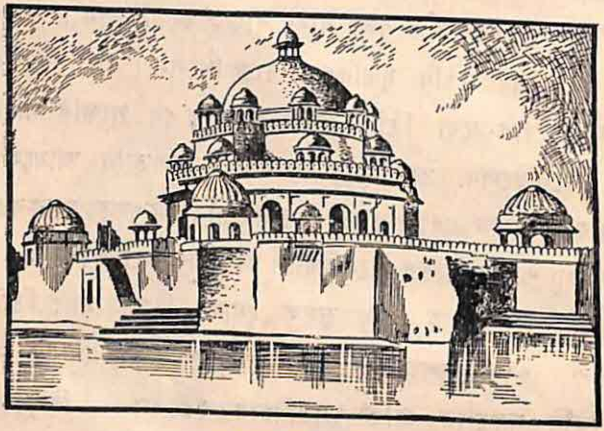
রাজ্যবিস্তার—সিংহাসনে বসবার কয়েক বছরের মধ্যে শের শাহ্ পাঞ্জাব ও মালব দেশ জয় করেন এবং বাংলার বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি এই সময়ের মধ্যে কতকগুলি দুর্গও অধিকার করেন। সেগুলির মধ্যে গোয়ালিয়র, চিতোর, রনথম্ভোর ও রায়সিন প্রধান।

শের শাহ্ মাত্র পাঁচ বছর যাবৎ রাজত্ব করেছিলেন। এরও বেশীর ভাগ সময় তিনি যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। তা' সত্ত্বেও এই অল্পকালের মধ্যে তিনি শাসন-ব্যবস্থায় যে সংস্কার সাধন করতে পেরেছিলেন, আগেকার বহু বছরের সুলতানি আমলেও তা' সম্ভবপর হয়নি এবং পরবর্তী বাদশাহ্‌রা; বিশেষতঃ আকবর, শের শাহের শাসন-নীতির অনেকখানি অনুসরণ করেছিলেন।

চরিত্র—শের শাহ্ শুধু সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন না; তিনি সুবিচারক এবং সুশাসকও ছিলেন। জাতি-ধর্ম বিচার না ক'রে তিনি সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করতেন। হিন্দুদের প্রতিও তাঁহার ব্যবহার ছিল উদার।

শাসন-প্রণালী—তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সরকার ও পরগণায় বিভক্ত ক'রে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে এই 'পরগণা' গঠিত হতো এবং কতকগুলি পরগণা নিয়ে 'সরকার'। শের শাহ্ সমগ্র সাম্রাজ্যের জমি জরিপ করিয়ে প্রত্যেক প্রজার জমির সীমানা নির্ধারিত ক'রে দিয়েছিলেন। উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজকররূপে ধার্য হয়েছিল।

তা' ছাড়া 'পাট্টা' ও 'কুবুলিয়ত'-এর প্রবর্তন ক'রে তিনি জমিতে জমিদারদের অধিকার ও প্রজাদের স্বত্ব স্থায়িভাবে সাব্যস্ত ক'রে দিয়েছিলেন। দেশে যাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা কোনভাবে ব্যাহত না হয় সেইজন্য তিনি শান্তিরক্ষা বিভাগের কর্মচারীদের কাজের উপর বিশেষভাবে নজর রাখতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তিনি রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করেন। ঐ সমস্ত মুদ্রার উপর ফারসী ও হিন্দী ভাষায় তাঁর নাম খোদিত থাকত।



শের শাহের সমাধি-ভবন

যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাটের উন্নতি প্রায়োজন। তা' না হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারও সম্ভবপর হয় না। এই অসুবিধা দূর করবার উদ্দেশ্যে তিনি রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতি করেন। বাংলা দেশ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত তিনি যে বিরাট রাস্তা তৈরি করেছিলেন, তা' আজও **গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড** নামে বর্তমান রয়েছে। শের শাহের শাসনকালে আর একটি

উল্লেখযোগ্য ঘটনা **ঘোড়ার ডাকের** প্রচলন। তখনকার দিনে দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। এই অসুবিধা দূর করবার উদ্দেশ্যে তিনি ঐ রকম ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেন। শের শাহের সুশাসনে দেশের মধ্যে চুরি-ডাকাতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দিল্লীর কাছে তিনি কতকগুলি সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করান। বিহারের সাসারামে শের শাহের সমাধি-ভবন সেকালের স্থাপত্যকীর্তির চমৎকার দৃষ্টান্ত।

শের শাহের মৃত্যুর পর—শের শাহ্ যে বংশের প্রতিষ্ঠা করেন তা' **শূরবংশ** নামে পরিচিত। শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ্ কয়েক বছর রাজত্ব করেন। ইতিমধ্যে শের শাহের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে নানাপ্রকারের ঘরোয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই সুযোগে হুমায়ুন শূরবংশের সুলতান সেকেন্দর শূরকে পরাজিত ক'রে দিল্লীর সিংহাসন পুনরধিকার করেন।

মনে রেখো

১৫৩০—৪০	খ্রীষ্টাব্দে—হুমায়ুনের রাজত্বকাল
১৫৪০—৪৫	" —শের শাহের রাজত্বকাল
১৫৪৫	" —শের শাহের মৃত্যু
১৫৪৫—৫৩	" —ইসলাম শাহের রাজত্বকাল
১৫৫৫	" —হুমায়ুনের দিল্লী অধিকার

অনুশীলনী

১। শের শাহের রাজ্যস্থাপনের কাহিনী সংক্ষেপে লিখ।
২। শের শাহের চরিত্র সম্বন্ধে কী জান?
৩। শের শাহের শাসন-প্রণালী বর্ণনা কর।
৪। শের শাহের শাসনকালের উল্লেখযোগ্য কীর্তি কী কী?

তৃতীয় অধ্যায়

আকবর—তাঁর শাসনকালের শ্রেষ্ঠত্ব ও বাণী

শের শাহের কাছে পরাজিত হবার পর হুমায়ুন যখন আশ্রয়ের খোঁজে পারস্যের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন পথে সিন্ধু প্রদেশের অমরকোটে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে। এই শিশুই আগামীকালের মহামতি আকবর।

শের শাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন আবার দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন বটে, কিন্তু বেশীদিন রাজত্ব ভোগ করা তাঁর ভাগ্যে ছিল না। কারণ সেই বছরেই তাঁর মৃত্যু হলো। একদিন তিনি যখন গ্রন্থাগারের উপরতলায় বসে, তখন সহসা নমাজের আজানধ্বনি শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসতে লাগলেন। এমন সময়ে তিনি পা পিছলে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলেন এবং সেই পতনেই তাঁর মৃত্যু হলো।

প্রথম জীবন—তখন আকবরের বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। সেই অল্প বয়সেই আকবরকে পিতার পরিত্যক্ত সিংহাসনে বসতে হলো। চারিদিকে তখন শত্রুর চক্রান্ত। একজন বয়স্ক ও বুদ্ধিমান অভিভাবক ছাড়া নাবালক সম্রাটের পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন। এই অবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে **বৈরাম খাঁ** নামে হুমায়ুনের একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত হলেন।

তখনো ভারতবর্ষে পাঠানশক্তি একেবারে লোপ পায়নি। তারা মোগলদের বিতাড়িত ক'রে আবার পাঠান-সাম্রাজ্য স্থাপনের

চিন্তায় বিভোর। মহম্মদ আদিল শাহ্ নামে জনৈক পাঠান সুলতানের একজন হিন্দু সেনাপতি ছিলেন; তাঁর নাম হিমু। হিমু ছিলেন বীর যোদ্ধা এবং সুদক্ষ সেনানায়ক। তিনি সহসা দিল্লী আক্রমণ ক'রে দখল ক'রে ফেললেন। বৈরাম খাঁ দেখলেন চরম বিপদ উপস্থিত। তিনি ভয়ে বিচলিত না হয়ে হিমুর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালালেন। পণিপথের প্রান্তরে আবার মোগল পাঠানে যুদ্ধ বেধে উঠল। যুদ্ধে হিমুর পরাজয় হলো। তিনি প্রাণ হারালেন; বৈরাম খাঁর জয় হলো। আকবর দিল্লীর বাদশাহ্ হলেন। এই, যুদ্ধই ভারতবর্ষের ইতিহাসে **'পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ'** নামে প্রসিদ্ধ।



আকবর

এই যুদ্ধের পর কিছুকাল যাবৎ বৈরাম খাঁই প্রকৃতপক্ষে আকবরের নামে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। কিন্তু বৈরাম খাঁর ব্যবহারে অনেকের মনেই ক্ষোভের সৃষ্টি হলো। আকবর নিজেও তাঁর স্বেচ্ছাচারিতায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। অবস্থা বুঝে তিনি রাজ্যের শাসন-কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে তুলে নিলেন। তখন আকবরের বয়স আঠারো বছর। আকবরের এই হস্তক্ষেপে বৈরাম খাঁ বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন এবং আকবরের

বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁর পরাজয় হলো। আকবর পরাজিত বৈরামকে কোন শাস্তি না দিয়ে মক্কায় যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু তিনি মক্কা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেন না। পথে এক আততায়ীর হাতে বৈরাম খাঁর মৃত্যু হলো।

রাজ্য-বিস্তার—এখন থেকে আকবর সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার সুযোগ পেলেন। প্রথমেই তিনি রাজ্য-বিস্তারে মনোযোগী হলেন। সারা ভারতবর্ষ তখন খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। আকবরের উদ্দেশ্য ছিল এই সমস্ত ছোট ছোট খণ্ড রাজ্যগুলিকে একত্র ক'রে একটি বিশাল অখণ্ড সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা। রাজ্য জয় করতে অবশ্য তাঁকে অনেক-গুলি যুদ্ধে নামতে হয়েছিল। প্রথমে তিনি জয় করলেন **মালব** রাজ্য। তারপর **গণ্ডোয়ানা**। এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে জয় করতে গিয়ে মোগল বাহিনীকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গণ্ডোয়ানার রাজা তখন নাবালক। তাঁর মাতা **রানী দুর্গাবতী** বিনা যুদ্ধে আকবরকে রাজ্য ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। নিজে তিনি হাতীতে চড়ে মোগল বাহিনীর সঙ্গে অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। যুদ্ধে অবশ্য মোগলের জয় হলো। রানী দুর্গাবতী যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মহত্যা করলেন। এইভাবে ক্রমাগত রাজ্যজয়ের ফলে কাশ্মীর থেকে নর্মদা পর্যন্ত এবং সিন্ধু থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত সমগ্র হিন্দুস্থান জুড়ে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হলো। এ ছাড়া গুজরাট, বেরার, খান্দেশ ও আহ্‌মদনগরের কিছু কিছু অংশও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।



BASIC TRAINING COLLEGE

তবে সাম্রাজ্য-বিস্তারের অভিযানে আকবরকে সবচেয়ে বেশী বাধা দিয়েছিলেন রাজপুতেরা। তখন সংগ্রাম সিংহের পুত্র **উদয়সিংহ** মেবারের রানা। আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করলে রাজপুতেরা উদয়সিংহের সেনাপতি জয়মল্ল ও পুত্তের অধীনে আপ্রাণ লড়াই করল মোগলদের সঙ্গে। যুদ্ধে জয়মল্লের মৃত্যু হলো, তবু রাজপুতেরা ভীত হলো না। দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে প্রতিটি রাজপুত অসামান্য বীরত্বের সঙ্গে লড়াই ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলো। রাজপুত রমণীরা মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে জহরব্রত অবলম্বন ক'রে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল। চিতোর শ্মশানভূমিতে পরিণত হলো।

যুদ্ধে রাজপুতদের পরাজয় হলো বটে কিন্তু আকবর মুগ্ধ হলেন রাজপুতজাতির বীরত্বে। তিনি ভাবলেন যে ভারতবর্ষে রাজ্যশাসন করতে গেলে এদের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অম্বররাজের কন্যাকে বিবাহ করলেন। অম্বর মিত্ররাজ্যে পরিণত হলো। এ ঘটনার দেখাদেখি বিকানীর ও যশল্মীরের রাজারাও বাদশাহ্‌কে কন্যাদান করলেন। কিন্তু এইভাবে রাজপুতানার সকল রাজাই আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেন না। মেবারের রানা **উদয়সিংহ** ও তাঁর পুত্র **প্রতাপসিংহ** আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। বাংলার সুলতান দায়ুদ খাও বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেননি। রাজমহলের যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হলেন। বাংলার ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় ইত্যাদি বার-ভূঁইয়ারা পরে বিদ্রোহী হন। তাঁদের দমন করতে আকবরকে বেশ বেগ পেতে

S.C.E.R.T. W.B. LIBRARY
Date ......9191...... 28/8/95
Accn. No.

হয়েছিল। বিজাপুরের আহ্‌মদনগরের রাজকন্যা ছিলেন রানী **চাঁদ সুলতানা** ; তিনি নিজে সৈন্য চালনা ক'রে মোগল বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছিলেন। আকবরকে শেষ পর্যন্ত আহ্‌মদনগরের সঙ্গে সন্ধি করতে হয়েছিল।

এইভাবে ৪৯ বছর ধরে সাম্রাজ্য শাসন ক'রে আকবর ৬৩ বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

শাসন-প্রণালী—আকবর বুঝতে পেরেছিলেন যে সুশাসনের উপর রাজ্যের ভিত্তি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। তাই তিনি নূতন নূতন নিয়মাবলী প্রবর্তনের দ্বারা শাসন-ব্যবস্থায় সুশৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করেন।

তিনি চারজন মন্ত্রীর সাহায্যে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। আগে সৈন্যবিভাগের পদস্থ কর্মচারীদের নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গীর দেওয়া হতো। এতে নানা রকমের অসুবিধার সৃষ্টি হতো। আকবর তাই সেই-প্রথা তুলে দিয়ে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। আগে হিন্দু প্রজাদের **জিজিয়া** নামে একপ্রকার কর দিতে হতো। আকবর এই কর-প্রথা রহিত করলেন। যোগ্যতানুযায়ী হিন্দু প্রজারাও মুসলমানদের মতো সরকারী চাকুরি পাবার অধিকারী হলো।

আকবরের বিশাল সাম্রাজ্য পনেরটি 'সুবা' বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সুবা আবার কয়েকটি 'সরকার' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তার উপাধি ছিল 'সিপাহ্‌সালার' বা 'সুবাদার'। প্রত্যেক প্রদেশে একজন ক'রে দেওয়ান থাকত। তাঁর উপর খাজনা আদায়ের ভার ছিল। জেলার শাসনকর্তাকে

377 T/69

বলা হতো 'ফৌজদার'। শহরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন 'কোতোয়াল'। যাঁরা বিচার করতেন তাঁদের বলা হতো 'কাজী'।

খাজনা-ধার্যের ব্যাপারেও আকবর নূতন নিয়মের প্রবর্তন করেন। শের শাহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে তিনি তাঁর মন্ত্রী **টোডরমল**-এর সাহায্যে সমস্ত জমি জরিপ করালেন। তারপর জমির উর্বরতা অনুযায়ী চাষের জমিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করলেন। উৎপন্ন শস্যের তিন ভাগের এক ভাগ অথবা তার সমান নগদ মূল্য রাজকররূপে ধার্য করা হলো।

আকবরের রাজসভা—বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার মতো আকবরের রাজসভায়ও অনেক জ্ঞানী-গুণীর স্থান হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে **মানসিংহ, টোডরমল, আবুল ফজল, ফৈজী, তানসেন, বীরবল** প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মানসিংহ ছিলেন সেনাপতি। টোডরমল ছিলেন রাজস্ব বিষয়ে অসাধারণ বিচক্ষণ ব্যক্তি। আবুল ফজল ও ফৈজী ছিলেন ঐতিহাসিক। আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর নামা' আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস। ফৈজী ছিলেন কবি। তানসেন ছিলেন অদ্বিতীয় সঙ্গীত-শিল্পী। বীরবল ছিলেন একাধারে যোদ্ধা, কবি ও হাস্যরসিক। পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে ইনি মারা যান। হিন্দী রামায়ণ রচয়িতা সাধক কবি **তুলসীদাস** ও ভক্তকবি **সুরদাস** আকবরের আমলের লোক ছিলেন।

আকবরের চরিত্র—ভারতবর্ষের মুসলমান বাদশাহ্‌দের মধ্যে আকবর ছিলেন নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। তিনি যেমন ছিলেন

সাহসী, তেমনি শক্তিশালী। নিজে লেখাপড়া না জানলেও সাহিত্য ও ধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। রাজদরবারের পণ্ডিতদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ক'রে তিনি জ্ঞান অর্জন করতেন। নানা ধর্মের সারাংশ সংগ্রহ করে আকবর **'দীন-ইলাহি'** নামে এক নূতন ধর্মমতের প্রবর্তন করেছিলেন। শিল্পের প্রতিও তাঁর আন্তরিক প্রীতি ছিল। ফতেপুর সিক্রির বহু চমৎকার ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ও হুমায়ুনের সমাধি-ভবন আকবরের আমলের স্থাপত্য-কীর্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিজে ইসলাম ধর্মের লোক হলেও অন্য ধর্মমতের প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল না। তাই তিনি জাতিধর্মনির্বিশেষে উদার ব্যবহারের দ্বারা সামস্ত প্রজার শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

আকবরের বাণী—জ্ঞানী এবং মহানুভব সম্রাট্ আকবর সারা জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা যে উঁচুদরের জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তা' তাঁর বাণী থেকে বুঝতে পারা যায়। যেমন—

রাজ্য রক্ষা করতে হলে ও তাকে স্থায়ী করতে হলে রাজার সঙ্গে প্রজার মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

জাতি-ধর্মের বিচার না ক'রে যোগ্যতার মর্যাদা স্বীকার করা উচিত এবং সেইভাবে প্রজার কল্যাণ করা রাজার কর্তব্য। নইলে কেবল বলপ্রয়োগের দ্বারা রাজ্যকে স্থায়ী করা যায় না।

ধর্মের গোঁড়ামিই পাপ। যুগে যুগে ধর্মের সংস্কার সাধন করা উচিত এবং কোন ধর্মকেই হেয় ভাবা অন্যায়।

শেষ জীবন—আকবরের শেষ জীবন বড় অশান্তিতে কাটে। তিন পুত্রের মধ্যে দুই পুত্রের অকালে মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র

সেলিম বিদ্রোহী হয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ঐতিহাসিক আবুল ফজলকে হত্যা করে।

এইভাবে পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করবার পর আকবরের মৃত্যু হয়। আগ্রার অনতিদূরে সেকেন্দ্রায় আজও মহান্ আকবরের সমাধি-ভবন দেখতে পাওয়া যায়।

মনে রেখো

১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে—আকবরের জন্ম
১৫৪৫ " —শেরশাহের মৃত্যু
১৫৫৬ " —হুমায়ুনের মৃত্যু ; আকবরের রাজ্যাভিষেক
পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ
১৬০৫ " —আকবরের মৃত্যু

অনুশীলনী

১। আকবরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে যা' জান বল।
২। বৈরাম খাঁ কে ছিলেন ?
৩। আকবরের রাজ্য-বিস্তার সম্বন্ধে কী জান বল।
৪। আকবরের রাজ্য-শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে কী জান ?
৫। 'দীন-ইলাহি' সম্বন্ধে কী জান বল ?
৬। আকরের চিতোর জয়ের কাহিনী সংক্ষেপে বল।
৭। আকবরের বাণী কী কী ?

চতুর্থ অধ্যায়

রানা প্রতাপ ও তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রাম

আকবর যখন মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন তখন রানা উদয়সিংহ সেনাপতি জয়মল্ল ও পুত্তের উপর রাজধানী রক্ষার ভার দিয়ে রাজধানী ছেড়ে চলে যান। চিতোর ধ্বংস হলো, একে একে প্রায় সমস্ত রাজপুত রাজগণ সম্রাট্ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেন, কেউ কেউ মোগল বাদশাহ্‌কে কন্যা দান করলেন পর্যন্ত, কিন্তু বীর রানা উদয়-সিংহ কিছুতেই উঁচু মাথা হেঁট করলেন না। তাঁর মনে দৃঢ় সঙ্কল্প রয়ে গেল যে যেভাবেই হোক্ আবার মেবারের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'উদয়পুর' গ্রামে নূতন রাজধানী স্থাপন ক'রে পার্বত্য অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর প্রাণের আশা পূর্ণ হলো না। নূতন রাজধানী স্থাপনের চার বৎসর পরে উদয়সিংহের মৃত্যু হলে,



রানা প্রতাপ

প্রথম জীবন—উদয়সিংহের মৃত্যুর পর রানা হলেন তাঁর পুত্র **প্রতাপসিংহ**। রানা হয়েই তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে কিছুতেই তিনি মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করবেন না। তিনি আরও প্রতিজ্ঞা করলেন যে যতদিন তিনি চিতোর উদ্ধার করতে না পারবেন, ততদিন তিনি দাড়ি কামাবেন না, সোনার থালার বদলে গাছের পাতায় আহার করবেন এবং তৃণশয্যায় শয়ন করবেন। চিতোর উদ্ধার করতে পারেননি ব'লে তিনি আজীবন এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন।

সিংহাসনে বসে প্রতাপ দেখলেন দেশের অবস্থা ভালো নয়। অধিকাংশ রাজপুত-রাজা মোগল শাসন মেনে নিয়েছেন। এমন কি তাঁর নিজের ভাই শক্তসিংহ পর্যন্ত আকবরের পক্ষে যোগ দিয়ে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। না আছে সুশৃঙ্খল সৈন্য-বাহিনী, না আছে রাজকোষে পর্যাপ্ত অর্থ। এমন অবস্থায় মনে হতাশা আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতাপের চরিত্রে ভয় ও হতাশার কোন স্থান ছিল না ; তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। মোগল সৈন্যেরা সংখ্যায় ছিল অগণ্য। সম্মুখ যুদ্ধে তাদের বাধা দেওয়া অসম্ভব মনে ক'রে তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে 'কমলমীরের কেল্লায়' এবং মেবারবাসীদের পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয় নিতে উপদেশ দিলেন। যে সমস্ত রাজপুত রাজারা মোগলদের সঙ্গে কন্যা ও ভগ্নীর বিবাহ দিয়েছিলেন, প্রতাপ তাঁদের মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। মানসিংহ একথা জানতেন। তারপর ঘটনাচক্রে এই সময় প্রতাপ ও মানসিংহের মধ্যে একবার

সাক্ষাৎকার হলো। মানসিংহ প্রতাপের ব্যবহারে নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন এবং প্রতাপের উপর প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প করলেন। ফলে মোগল ও রাজপুতের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল।

হলদিঘাটের যুদ্ধ—দেখতে দেখতে **হলদিঘাটে** মহারাজ মানসিংহের নেতৃত্বে আকবরের প্রায় এক লক্ষ সৈন্য সমবেত হলো। এই বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র বাইশ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রতাপ যুদ্ধ করতে অগ্রসর হলেন। হলদিঘাটের গিরি-সঙ্কটে মোগল ও রাজপুতে ঘোরতর যুদ্ধ বাধল। প্রতাপ ও তাঁর সৈন্যেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন কিন্তু জয়লাভ করতে পারলেন না। এমন কি প্রতাপের জীবনও বিপন্ন হলো। এমন সময় **ঝালাপতি মান্না** নামে একজন প্রভুভক্ত রাজপুত সর্দার নিজের জীবন দান ক'রে প্রতাপের জীবন রক্ষা করলেন। ক্ষত-বিক্ষত দেহে প্রতাপ তাঁর বিশ্বস্ত অশ্ব চৈতকের পিঠে উঠে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ স্থানে চললেন।

দু'জন মোগল সৈন্য প্রতাপের পিছন পিছন ছুটে গেল। প্রতাপের ভাই শক্তসিংহ মোগলবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। দাদার বীরত্ব ও স্বদেশপ্রীতি দেখে তাঁর কঠিন প্রাণও বিচলিত হয়ে উঠল। নিজের অন্যায়ের জন্য মনে মনে তিনি লজ্জা অনুভব করলেন। শক্তসিংহ তখনি ছুটে গিয়ে মোগল সেনা দু'টিকে বধ ক'রে দাদার পবিত্র জীবন রক্ষা করলেন। শক্তকে দেখতে পেয়েই প্রতাপ দাঁড়ালেন। শক্তসিংহের মুখে কথা ফুটল না। তাঁর চোখ-মুখের দিকে চেয়েই প্রতাপ বুঝতে

পারলেন যে তাঁর ভাই মনে মনে অনুতপ্ত এবং তাঁর ক্ষমাপ্রার্থী। তিনি সব ভুলে গিয়ে শক্তসিংহকে আনন্দে আলিঙ্গন করলেন। ভাইয়ে ভাইয়ে আবার সদ্ভাবের সম্পর্ক স্থাপিত হলো।

হলদিঘাটের পরে—চরম দুর্গতির মধ্যেও প্রতাপ সঙ্কল্পে অবিচলিত রইলেন—কিছুতেই মোগলের অধীনতা স্বীকার করা হবে না। রাজ্যহারা প্রতাপ স্ত্রীপুত্রকন্যাদের সঙ্গে নিয়ে অনাহারে অনিদ্রায়, বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কখনো ঘাসের বীজের রুটি খেয়ে, কখনো বনের ফল, ঝরনার জল খেয়ে, গাছের তলায় বা পাহাড়ের গুহায় শুয়ে তাঁর দিন কাটতে লাগল। সেই অবস্থায়ও মোগল সৈন্য তাঁকে তাড়া ক'রে বেড়াতে লাগল। প্রতাপ সব জানতে পারলেন কিন্তু তবুও মোগল বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করতে তাঁর মন সরল না। মানই যদি গেল তবে শুধু প্রাণ নিয়ে কোনমতে বেঁচে থেকে লাভ কী? স্বাধীনতার জন্য, আত্মসম্মানের জন্য তিনি সব রকম দুঃখকষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু নিরপরাধ শিশু পুত্রকন্যাদের অসহ্য দুঃখ বীরের হৃদয়কেও টলাতে লাগল। অথচ সে অবস্থায় প্রতিকারের কোন পথ সাম্‌নে খোলা নেই। বাধ্য হয়ে প্রতাপ ভেবে ভেবে একবার স্থির করলেন যে তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করবেন। তবু শিশুদের তো জীবন বাঁচবে কিন্তু বীরের হৃদয়ে এই ধরণের দুর্বল চিন্তা কতক্ষণ ঠাঁই পেতে পারে? শেষ পর্যন্ত সে সঙ্কল্প তিনি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন। স্থির করলেন, মরুভূমি পার হয়ে সিন্ধুদেশে চলে যাবেন। এই সময় **ভামশা** নামে

রানাবংশের একজন বৃদ্ধ মন্ত্রী স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাঁর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ প্রতাপকে দান করলেন। হাতে প্রচুর টাকা পেয়ে প্রতাপের মনোবল বেড়ে গেল। সেই টাকায় তিনি সৈন্য সংগ্রহ ক'রে মোগলদের সঙ্গে লড়াই ক'রে একে একে প্রায় সমস্ত হারানো দুর্গগুলির উদ্ধার ক'রে ফেললেন। শুধু সাধের চিতোর মোগলের অধিকারে রয়ে গেল।

শেষ জীবন—ক্রমাগত অনিয়ম অত্যাচারে এবার প্রতাপের স্বাস্থ্যে ভাঙন ধরল। তিনি মনে মনে বুঝতে পারলেন যে তাঁর পরমায়ু ফুরিয়ে আসছে। মৃত্যুর আগে তিনি পুত্র অমরসিংহ ও অন্যান্য ভক্ত রাজপুত সর্দারদের ডেকে বললেন যে তাঁরা যেন কখনই মোগলের বশ্যতা স্বীকার না করেন এবং দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত চিতোর উদ্ধার করবার জন্য লড়াই করেন।

পৃথিবীতে বীরের অভাব নেই কিন্তু স্বাধীনতার জন্য সর্বস্বত্যাগী বীর যোদ্ধা রানা প্রতাপসিংহের মতো বীরের সংখ্যা খুবই কম।

রানা প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অমরসিংহ রানা হন। তিনি মোগলদের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেছিলেন। তবে তিনি তাঁর পিতার মতো সাহস ও মনোবলের অধিকারী ছিলেন না। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি মোগল বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হন।

যাই হোক, চিতোরের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার না হলেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বাধীনতার পূজারী রানা প্রতাপের কীর্তি-কাহিনী চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

TRAINING COLLEGE

মনে রেখো

১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে—রানা প্রতাপের সিংহাসন লাভ
১৫৭৬ " —হলদিঘাটের যুদ্ধ
১৫৯৭ " —রানা প্রতাপের মৃত্যু
১৬১৫ " —অমরসিংহ কর্তৃক জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার

অনুশীলনী

১। রানা প্রতাপের বীরত্ব ও মহত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
২। হলদিঘাটের যুদ্ধের বিবরণ দাও।
৩। প্রতাপের শেষজীবন কিভাবে কেটেছিল ?
৪। রানা প্রতাপকে স্বাধীনতার পূজারী বলা হয় কেন ?

পঞ্চম অধ্যায়

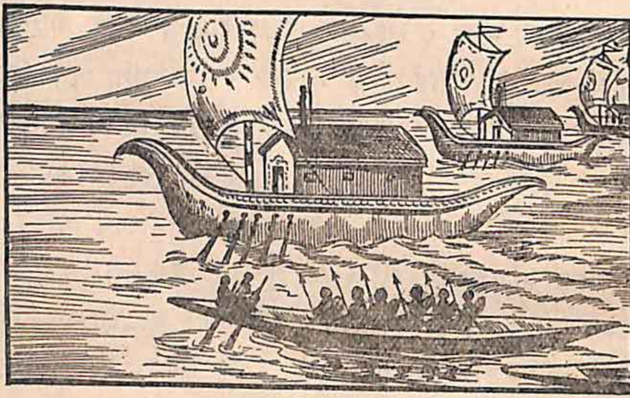
চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খাঁ

বাংলা দেশে প্রথমে মুসলমান-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন বক্তিয়ার খল্‌জী। সে আজ থেকে প্রায় সাড়ে সাত শ' বছর আগেকার কথা। তারপর প্রায় দেড় শ' বছর যাবত বাংলা দেশ দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অধীনে একটি প্রদেশ ছিল। বাংলার শাসনকর্তাদের তখন দিল্লীর সুলতানদের কর দিতে হতো ; কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁরা একরকম স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। দিল্লীর এই সুলতানী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে মোহম্মদ বিন্ তুঘলুকের আমলে। সেই সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। তাদের মধ্যে বাংলা দেশ অন্যতম। **হোসেন শাহ্** ছিলেন সেই স্বাধীন বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান।

শের শাহ্ তখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি হোসেন শাহের পরবর্তী এক সুলতানকে পরাজিত করে বাংলা দেশ অধিকার করেন। কিন্তু তাঁর অযোগ্য বংশধরদের আমলে বাংলা আবার স্বাধীনতা ফিরে পায়। বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান **দাউদ খাঁকে** পরাজিত করে সম্রাট্ আকবর বাংলা দেশকে মোগল সাম্রাজ্যের একটি সুবায় পরিণত করেন।

দাউদ খাঁ পরাজিত হলেন বটে কিন্তু বাংলাদেশ সহজে পরাধীনতা বরণ করে নিল না। তার প্রাণশক্তি অপরাজেয়

শৌর্যে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তখন বাংলা দেশে অনেক বড় বড় জমিদার ছিলেন। তাঁরা মোগল শাসনের অধীনে থেকে প্রায় স্বাধীন রাজাদের মতোই চলাফেরা করতেন। তাঁদের নিজস্ব কামান, বন্দুক, যুদ্ধ-জাহাজ প্রভৃতি ছিল। এই



চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের সময়ের রণতরী

সব জমিদারদের মধ্যে বারো জন ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপশালী। তাঁরা বাংলার ইতিহাসে 'বারো-ভুঁইয়া' নামে পরিচিত। 'ভুঁইয়া' শব্দের অর্থ হলো ভৌমিক বা জমিদার। এঁদের বশে রাখা মোগল বাদশাহের পক্ষে খুব কঠিন ছিল। সময় সময় এঁরা মোগল বাদশাহ্‌কে কর দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে একবারে স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করতেন। তখন এঁদের দমন করবার জন্য দিল্লী থেকে ফৌজ পাঠাতে হতো এবং কখনো কখনো সে ফৌজ এঁদের কাছে পরাজিত হয়ে যেত।

চাঁদ রায়-কেদার রায়—এঁরা ছিলেন দুই ভাই এবং বিক্রমপুরের জমিদার। এঁদের রাজধানী ছিল ঢাকা জেলার শ্রীপুরে। এঁরা জাতিতে ছিলেন কায়স্থ।

চাঁদরায়-কেদাররায় যখন বিক্রমপুরে রাজত্ব করছিলেন তখন বাংলায় চারিদিক থেকে বিশৃঙ্খলা বর্তমান। মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে পূর্ব বাংলার লোক বিপর্যস্ত। এই সময় চাঁদরায়-কেদাররায়ের মনে স্বাধীনতার বাসনা জেগে ওঠে। এঁদের ইচ্ছা ছিল মোগল শাসনের হাত থেকে বাংলা দেশকে উদ্ধার ক'রে বিক্রমপুরে এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু অসীম শক্তিশালী মোগল বাহিনীর সঙ্গে একা লড়াই করা অসম্ভব মনে ক'রে এঁরা সমস্ত ভুঁইয়াদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করেন।

ঐ সময়ে **সোনার গাঁয়ে ঈশা খাঁ** নামে একজন ভুঁইয়া ছিলেন। তাঁর সঙ্গে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এঁদের ইচ্ছা ছিল ঈশা খাঁর সঙ্গে মিলে একত্রে নিজেদের রাজ্য স্বাধীন করবেন। কিন্তু কোন পারিবারিক বিষয় নিয়ে ঈশা খাঁর সঙ্গে চাঁদরায়-কেদাররায়ের বিশেষ মনোমালিন্য ঘটে। শেষ পর্যন্ত সেই মনোমালিন্যের সূত্র ধরে উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। এতে চাঁদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ল। তিনি ছোট ভাই কেদার রায়ের উপর ঈশা খাঁকে শাস্তি দিবার ভার দিয়ে ধর্মে মন দিলেন। এর অল্প দিন পরেই চাঁদ রায়ের মৃত্যু হলো। তখন কেদার রায় ঈশা খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে রত। দাদার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কেদার রায় বাড়ী ফিরে এলেন।

বঙ্গোপসাগরে সন্দীপ নামে একটি দ্বীপ আছে। তখন সন্দীপ একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ঐ দ্বীপটি ছিল তখন মুসলমানদের অধিকারে। কেদাররায় মুসলমানদের যুদ্ধে পরাজিত করে ঐ দ্বীপটি কেড়ে নেন এবং পর্তুগীজদের বাস ও ব্যবসা করবার জন্য দান করেন। পরে মুসলমানরা ও মগেরা যখন সন্দীপ আক্রমণ করে তখন কেদাররায় ও সন্দীপের শাসনকর্তা কার্ভালো মিলে তাদের বিতাড়িত করেন।

বাংলার বিদ্রোহী ভুঁইয়াদের দমন করবার উদ্দেশ্যে মানসিংহ সৈন্যসামন্ত নিয়ে তখন বাংলা দেশেই ছিলেন। সন্দীপের ব্যাপারে অপমানিত হয়ে তিনি কেদাররায়কে দমন করবার জন্য বহু জাহাজ ও সৈন্য দিয়ে মান্দারায় নামে একজন সেনাপতিকে পাঠালেন। পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতি কার্ভালো নৌবহর নিয়ে কেদাররায়ের পক্ষে যোগ দিলেন। মেঘনা নদীবক্ষে উভয় পক্ষে ভীষণ জলযুদ্ধ হলো। সেই যুদ্ধে মান্দারায় মারা গেলেন এবং মোগল সৈন্যের পরাজয় হলো।

এবার সৈন্যসামন্ত নিয়ে মানসিংহ নিজে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন। কারণ তিনি বুঝতে পারলেন যে কেদাররায়কে দমন করতে না পারলে বাংলাদেশে মোগলদের আধিপত্য লোপ পাবে। প্রথমেই তিনি যুদ্ধ না ক'রে কেদারকে ভয় দেখিয়ে একজন দূত পাঠালেন কেদারের কাছে। দূতের হাতে ছিল শিকল, তরবারি ও একখানি চিঠি। কেদার সেই চিঠি পড়ে উত্তেজিত হয়ে গেলেন। শিকলের উপর পদাঘাত ক'রে তিনি তরবারি হাতে তুলে নিলেন এবং মানসিংহের চিঠির এক কড়া জবাব লিখে দূতের মারফৎ পাঠিয়ে

দিলেন। মানসিংহ চিঠির উত্তর পড়ে এবং দূতমুখে কেদাররায়ের ঔদ্ধত্যের কথা শুনে রাগে ফেটে পড়লেন। দেখতে দেখতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে মোগলের কামান গর্জে উঠল। নয় দিন জলে স্থলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলল। কেদার সমানভাবে বিপুল মোগল বাহিনীর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেলেন। যুদ্ধের দশম দিনে সহসা শত্রুপক্ষের একটি কামনের গুলি লেগে কেদার আহত হয়ে পড়লেন। সেই রক্তাক্ত অবস্থায় মোগল সৈন্যেরা তাঁহাকে বন্দী ক'রে মানসিংহের কাছে নিয়ে চলল। কিন্তু পথে বন্দী অবস্থায় কেদারের মৃত্যু হলো।

এখনও পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও ফরিদপুর জেলায় চাঁদরায় ও কেদাররায়ের অনেক কীর্তি আছে।

প্রতাপাদিত্য—প্রতাপাদিত্য ছিলেন, বারো ভুঁইয়ার অন্যতম। এঁর পিতার নাম ছিল বিক্রমাদিত্য, পিতৃব্যের নাম বসন্ত রায়। এঁরা জাতিতে ছিলেন বঙ্গজ কায়স্থ।

আকবর যখন দিল্লীর সম্রাট, তখন বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় গৌড়ের সুলতান দাউদ খাঁর অধীনে চাকুরি করতেন। দাউদ খাঁর পতনের পর তাঁরা সুন্দরবন অঞ্চলে জমিদারী কিনে জমিদার হয়ে বসেন। এই সুন্দরবন অঞ্চলের বন-জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে তাঁরা একটি শহর গড়ে তোলেন। এই শহরের নাম যশোর।

ছোটবেলা থেকেই প্রতাপ তীর ছোঁড়া, ঘোড়ায় চড়া, শিকার করা ইত্যাদি দুঃসাহসিক কাজ ভালোবাসতেন। অনেক সময় তিনি বন্ধুদের সঙ্গে সুন্দরবনের জঙ্গলে গিয়ে বাঘ, কুমীর প্রভৃতি

শিকার করে আসতেন। বাল্যকাল থেকে তিনি একজন স্বাধীন রাজা হবার স্বপ্ন দেখতেন! মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে কেবলমাত্র একজন জমিদার হয়ে থাকার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। অথচ তাঁর পিতা বিক্রমাদিত্যের ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। তিনি চাইতেন প্রতাপ যেন কখনো মোগল বাদশাহের সঙ্গে গণ্ডগোল না করে; কিন্তু প্রতাপের ভাবগতিক লক্ষ্য ক'রে তাঁর সে ধারণা বদলে গেল। তিনি ছোট ভাই বসন্ত রায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন যে প্রতাপকে একবার দিল্লীতে পাঠাতে হবে। তাঁরা মনে ভাবলেন প্রতাপ দিল্লীতে গিয়ে স্বচক্ষে মোগল বাদশাহের ঐশ্বর্য, ও সৈন্যবল দেখলে হয়তো ভয় পেয়ে আর বাদশাহের সঙ্গে বিরোধ বাধাতে সাহস পাবে না।

কিন্তু ফল হলো বিপরীত। প্রতাপ দিল্লীতে গিয়ে বাদশাহকে বুঝালেন যে তাঁর পিতা ও পিতৃব্য উভয়েই বৃদ্ধ হয়েছেন; তাঁরা ঠিকমত জমিদারী পরিচালনা করতে পারছেন না এবং সেইজন্য সময়মত সদর-খাজনা দেওয়া সম্ভব হয় না। তাঁকে যদি জমিদারী পরিচালনার ভার দেওয়া হয়, তা' হলে তিনি সময়মত সদর-খাজনা দাখিলের দায়িত্ব নিতে পারেন। প্রতাপের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের পর সম্রাট্ আকবর তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি প্রতাপের যুক্তি গ্রহণ করে যশোরের জমিদারী পরিচালনার সনদ দিয়ে দিলেন।

পিতা বেঁচে থাকতে থাকতেই প্রতাপ জমিদারীর ভার নিজের হাতে নিয়ে নিজেকে যশোরের রাজা বলে ঘোষণা করলেন। তারপর মনের বাসনা পূর্ণ করবার জন্য উপযুক্ত

আয়োজন শুরু করলেন। প্রথমে তিনি ধুমধাটে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়ে সেখানে রাজধানী স্থাপন করলেন। সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে গেলে মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য। তাই তিনি আরও নানা স্থানে অনেক দুর্গ নির্মাণ এবং উপযুক্ত সংখ্যায় জাহাজ ও কামান প্রস্তুত করাতে লাগলেন। তারপর ইউরোপীয় ধরণে সৈন্যদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রডা নামে একজন পর্তুগীজকে নিযুক্ত করলেন।

ইতিমধ্যে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হলো। পিতার মৃত্যুর পর প্রতাপ আরও রাজ্য বিস্তার করলেন। তারপর মোগল বাদশাহের প্রাপ্য সদর-খাজনা বন্ধ ক'রে দিয়ে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করলেন।

এই সংবাদ শুনতে পেয়ে সম্রাট্ আকবর প্রতাপকে দমন করবার আদেশ দিলেন। এই আদেশ অনুসারে মহারাজ মানসিংহ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন। উভয়পক্ষে যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধের প্রথম দিকে প্রতাপের বাঙালী সৈন্যেরা অসীম কৃতিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করল। মোগল সৈন্যের পরাজয় প্রায় আসন্ন হয়ে উঠল। এই সময় ভবানন্দ মজুমদার নামে প্রতাপের একজন পুরানো কর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হলো। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে প্রতাপের পরাজয় হলো। তিনি বাধ্য হয়ে মানসিংহের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন।

ইতিমধ্যে বাংলার সুবাদার হয়ে এলেন ইসলাম খাঁ। মানসিংহ চলে যাবার কিছুদিন পরে ইসলাম খাঁর সঙ্গে প্রতাপের গণ্ডগোল বেধে উঠল। ইসলাম খাঁ রেগে গিয়ে প্রতাপকে আক্রমণ ক'রে

বসলেন। আবার যুদ্ধ বাধল। তিনি অনেকগুলি যুদ্ধজাহাজ ও এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল দিয়ে সেনাপতি এনায়েৎ খাঁকে প্রতাপের বিরুদ্ধে পাঠালেন। প্রতাপের সৈন্যদল বীর বিক্রমে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগল বটে কিন্তু ভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে প্রতাপের পরাজয় হলো। ইসলাম খাঁ প্রতাপকে বন্দী করলেন; তারপর এক লোহার খাঁচায় পুরে নৌকাযোগে তাঁকে আগ্রায় পাঠিয়ে দিলেন।

এত বড় অপমানে প্রতাপের দেহ মন ভেঙে পড়ল। আগ্রায় যাবার পথে কাশীধামে তাঁর মৃত্যু হলো। মোগল বাহিনী প্রতাপাদিত্যের রাজ্য দখল ক'রে নিল।

ঈশা খাঁ—ঈশা খাঁ প্রথম জীবনে গৌড়ের সুলতান বায়েজিদ খাঁর অধীনে সামান্য একজন সৈনিকরূপে কাজে যোগদান করেন। বায়েজিদ খাঁর মৃত্যু হলে দাউদ খাঁ যখন বাংলার সুলতান হন, তখন তাঁর অধীনে তিনি সেনাপতির পদে উন্নীত হন। তারপর মানসিংহ দাউদ খাঁকে পরাজিত করবার পর ঈশা খাঁ নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার বলে জমিদার হয়ে বসেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা রংপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় এঁর জমিদারী বিস্তৃত হয়। কেউ কেউ বলেন ঈশা খাঁর রাজধানী ছিল 'খিজিরপুরে'।

ঈশা খাঁর পিতা ছিলেন জাতীতে বৈশ্য। তাঁর নাম কালিদাস গজদানী। ব্যবসা করবার উদ্দেশ্যে তিনি অযোধ্যা থেকে বাংলায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। পরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ ক'রে তিনি সোনার গাঁয়ে কিছু জায়গীর লাভ করেন।

BASIC TRAINING COLLEGE

বাংলাদেশে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে ঈশা খাঁ নামে মাত্র তাঁদের অধীন রইলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বাধীনভাবেই চলতে লাগলেন। তাঁর মনে মনে ইচ্ছা রয়ে গেল মোগলদের আধিপত্য থেকে মুক্ত ক'রে বাংলা দেশকে স্বাধীন করা। অথচ তা' করতে গেলে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই হবে। এই উদ্দেশ্যে কামান, বন্দুক, ও নানা স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিয়ে নিজেকে শক্তিশালী ক'রে তুলতে লাগলেন। তারপর নিজের শক্তির সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েই তিনি বাদশাহের খাজনা বন্ধ ক'রে দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন।

এই সংবাদ জানতে পেরে ঈশা খাঁকে দমন করবার জন্য সাম্রাট আকবর শাহবাজ খাঁ নামে একজন সেনাপতিকে প্রেরণ করলেন। শাহবাজ খাঁ বহুদিন ধরে ঈশা খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত ঈশা খাঁ বাধ্য হয়ে শাহবাজ খাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে ঈশা খাঁ অন্যান্য বিদ্রোহী পাঠানদের সঙ্গে মিশে সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করলেন। তখন স্বয়ং মানসিংহ এসে ঈশা খাঁর এগার সিন্ধু দুর্গ আক্রমণ করলেন।

ঈশা খাঁ নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন না। সৈন্যরাই তার পক্ষ থেকে যুদ্ধ করতে লাগল। এই নিয়ে মানসিংহ বিদ্রূপ প্রচার করলেন যে ঈশা খাঁ ভয়ে পালিয়ে রয়েছেন। এই কথা শুনে ঈশা খাঁ মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন।

মানসিংহ সম্মত হলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রথম দিকেই ঈশা খাঁর তরবারির আঘাতে মানসিংহের তরবারিখানি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। ঈশা খাঁ তখন তাকে আর একখানি তরবারি দিতে

চাইলেন। লজ্জায় মানসিংহের মাথা নীচু হয়ে গেল। তিনি আর তরবারি না নিয়ে ঈশা খাঁকে 'বন্ধু সম্বোধন ক'রে আলিঙ্গন



মানসিংহ ও ঈশা খাঁ

করলেন। দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হলো। ঈশা খাঁ সম্রাটের বশ্যতা স্বীকারে রাজী হলেন এবং মানসিংহের সঙ্গে আগ্রায় গেলেন। সম্রাট আকবর ঈশা খাঁর বীরত্বের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে **মসনদ্-ই আলী** অর্থাৎ ঈশ্বরের সিংহাসন—

উপাধি ও ২২টি পরগনার জমিদারী দিয়ে সম্মানিত করলেন। বাকি জীবন ঈশা খাঁ সোনার গাঁয়ের শাসনকর্তারূপে আকবরের অধীনতা মেনে চলেছিলেন।

মনে রেখো

১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে—আকবরের রাজত্বকাল
১৫৭৫-৭৬ ,, —দাউদ খাঁর পরাজয় ও মৃত্যু
১৫৯৪-১৬০৬ ,, —মানসিংহের বাংলা শাসনকাল
১৫৯৩ ,, —চাঁদ রায়ের মৃত্যু
১৫৯৯ ,, —প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক
১৬০১ ,, —কেদার রায়ের সঙ্গে মানসিংহের যুদ্ধ
১৬০৩ ,, —কেদার রায়ের মৃত্যু

অনুশীলনী

১। 'বার-ভুঁইয়া' কাদের বলা হয়?

২। চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খাঁ সম্বন্ধে কী জান?

৩। মোগলদের সঙ্গে প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খাঁর যুদ্ধ-কাহিনী সংক্ষেপে বল।

৪। মোগলদের সঙ্গে ঈশা খাঁর বন্ধুত্ব হয় কী ভাবে?

৫। কেদার রায়ের প্রধান কীর্তি কী?

৬। প্রতাপাদিত্য কিভাবে জমিদারীর ভার পেলেন?

৭। রডা কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কী জান বল।

শাহ্‌জাহান ও তাঁর রাজত্বকালের জাঁকজমক

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম **জাহাঙ্গীর** অর্থাৎ বিশ্ববিজয়ী উপাধি ধারণ করে দিল্লীর বাদশাহ্ হলেন। জাহাঙ্গীর বাইশ বছর যাবৎ রাজত্ব করেন।



জাহাঙ্গীর



নূরজাহান

জাহাঙ্গীরের বেগম ছিলেন নূরজাহান। 'নূরজাহান' শব্দের অর্থ জগতের আলো। নূরজাহান পূর্বে বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানের পত্নী ছিলেন। শের আফগানের মৃত্যুর

পর তাঁর বিধবা পত্নী মেহেরউন্নিসাকে জাহাঙ্গীর পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় নূরজাহান।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই ইংরাজেরা প্রথমে ভারতবর্ষে এসে সুরাটে কুঠি নির্মাণ করে। স্যার টমাস রো নামে একজন



স্যার টমাস রো-র দৌত্য

ইংরাজ রাজদূত জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে এসে ইংরাজ বণিকদের জন্য নানাপ্রকারের সুযোগ-সুবিধা আদায় ক'রে নেন।

জাহাঙ্গীরের যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁর তৃতীয় পুত্র 'খুরম' ছিলেন দক্ষিণাপথে। ইতিপূর্বে তাঁর বড় দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছিল। সুতরাং পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়েই তিনি দিল্লীতে ফিরে এলেন এবং নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে সম্রাট হলেন। তখন খুরমের উপাধি হলো শাহ্‌জাহান বা জগৎপতি।

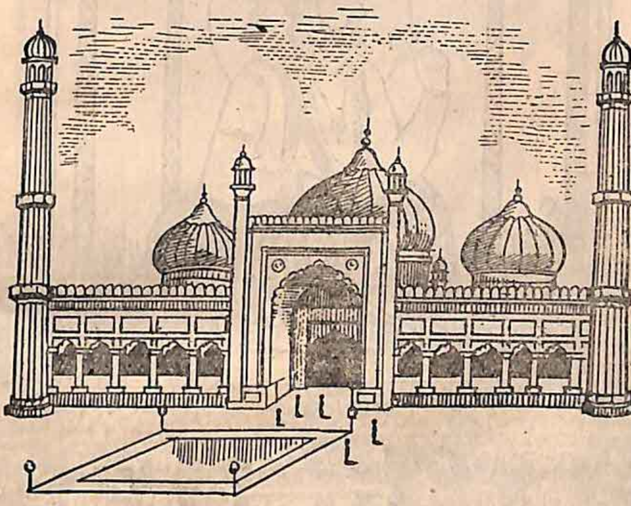
শাহ্‌জাহানের রাজ্য-শাসন—সম্রাট্‌ হয়ে শাহ্‌জাহান তাঁর জ্ঞাতি-গোষ্ঠির অনেককে হত্যা করেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন হিন্দু-বিদ্বেষী। তিনি হিন্দুদের অনেক মন্দিরও ধ্বংস করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর সে মনোভাবের পরিবর্তন হয়। সিংহাসনে বসবার পর দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাজ্য-বিস্তারের জন্য তাঁকে কতকগুলি যুদ্ধ করতে হয়। এই সময়ে পর্তুগীজরা পশ্চিমবঙ্গে ভীষণ উপদ্রব করত। হুগলীতে ছিল এদের একটি উপনিবেশ। এদের অত্যাচারের ভয়ে ভাগীরথীর দুই তীরের লোক সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকত। শাহ্‌জাহান বাংলার শাসনকর্তা কাশিম খাঁর সাহায্যে পর্তুগীজদের বন্দী ক'রে আগ্রায় নিয়ে গেলেন এবং তাদের হুগলী কুঠি দখল ক'রে নিলেন। এই ঘটনার পর পর্তুগীজরা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যায়।


শাহ্‌জাহান

তারপর শাহ্‌জাহান রাজ্য বিস্তারে মন দেন। বহুদিন যাবৎ যুদ্ধ ক'রে তিনি দাক্ষিণাত্যের আহ্‌মদনগর জয় করেন এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাকে বশে আনেন। তিনি মধ্য এশিয়ার দু' একটি রাজ্যও জয় করেছিলেন, কিন্তু কোনটিকেই বেশীদিন দখলে রাখতে পারেন নি।

শাহ্‌জাহান মোটের উপর দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ সম্রাট্‌ ছিলেন। তাঁর শাসনকালে দেশ থেকে চুরি-ডাকাতি অনেক পরিমাণে কমে গিয়েছিল। প্রজার উপরও তাঁর দরদ ছিল যথেষ্ট। সব সময় তিনি প্রজার মঙ্গলের চিন্তা করতেন।

শাহ্‌জাহানের জাঁকজমক—শাহ্‌জাহান নিজে বেশ বিলাসী সম্রাট্‌ ছিলেন। তিনি খুব জাঁকজমক পছন্দ করতেন। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল ইতিহাসে জাঁকজমকের জন্য প্রসিদ্ধ



জুম্মা মসজিদ—দিল্লী

হয়ে আছে। তিনি বহু অর্থব্যয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর ইমারত নির্মাণ করান। দিল্লীর বিখ্যাত **জুম্মা মসজিদ, দেওয়ান-ই-খাস ও দেওয়ান-ই-আম** এবং আগ্রার **মোতি মসজিদ** শাহ্‌জাহানের

তবে সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি **তাজমহল**। আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে তাঁর প্রিয়তমা বেগম **মমতাজমহলের** কবরের উপর এটি নির্মিত হয়। শোনা যায় প্রায় কুড়ি হাজার লোক দৈনিক পরিশ্রম করে কুড়ি বছরে এটিকে নির্মাণ করে। এমন সুন্দর সমাধি-ভবন পৃথিবীর আর কোথাও নেই। পৃথিবীর নানা দেশের লোক এখনও তাজমহল দেখতে আগ্রায় এসে থাকে।

বেগম মমতাজমহলকে শাহ্‌জাহান অত্যন্ত ভালোবাসতেন। মমতাজ ছিলেন নূরজাহানের ভ্রাতার কন্যা এবং পিসীমার মতই রূপে-গুণে অদ্বিতীয়া। বাদশাহী লাভের পর তাঁদের দিন যখন মহা আনন্দে কাটছে তখন নাকি মমতাজ শাহ্‌জাহানকে বলেছিলেন—'যদি আমি আগে মরি, তা হলে আমার সমাধি-ক্ষেত্রের উপর এমন একটি সৌধ করে দেবেন যাতে আমি পৃথিবীর লোকের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারি'। সম্রাট্ বেগমের ইচ্ছা পূরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বাদশাহী লাভের চার বছর পরেই মমতাজের মৃত্যু হয়। শাহ্‌জাহান তখন প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য অজস্র অর্থব্যয় ক'রে বহু মূল্যবান মণিমুক্তা ও পাথর সংগ্রহ ক'রে এই সমাধি-সৌধ নির্মাণ করান এবং মমতাজমহলের নাম অনুসারে নাম রাখেন 'তাজমহল'। কত শত বৎসর কেটে গেছে কিন্তু আজও দেখলে মনে হয় তাজমহল যেন মাত্র সেদিনের তৈরী।

শেষজীবন—শাহ্‌জাহানের শেষ জীবন বড় অশান্তির মধ্যে কাটে। তাঁর চারিটি পুত্র ছিল। তাদের নাম—দারা, সুজা, ঔরংজীব ও মোরাদ। এদের মধ্যে ঔরংজীব ছিলেন সব চেয়ে

চতুর। তিনি অপর তিন ভাইকে কৌশলে পরাজিত, বিতাড়িত, বা নিহত করে এবং পিতা শাহ্‌জাহানকে আগ্রার প্রাসাদে বন্দী ক'রে সিংহাসন অধিকার করেন। সাধারণতঃ পিতার পরিত্যক্ত সিংহাসনে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই অগ্রাধিকার থাকে। কিন্তু শাহ্‌জাহান জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র হয়েও সিংহাসনের যেমন অধিকারী হয়েছিলেন, ঔরংজীবের বেলায়ও তাই হলো। শাহ্‌জাহান আট বছর বন্দীদশায় জীবন কাটিয়ে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পর তাঁকে তাঁর প্রিয়তমা বেগম মমতাজের কবরের পাশেই সমাহিত করা হয়।

মনে রেখো

১৬২৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে—শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল
১৬২৬ „ —শাহ্‌জাহানের রাজ্যাভিষেক
১৬৫৮ „ —শাহ্‌জাহানের বন্দীত্ব ও ঔরংজীবের সিংহাসন দখল

অনুশীলনী

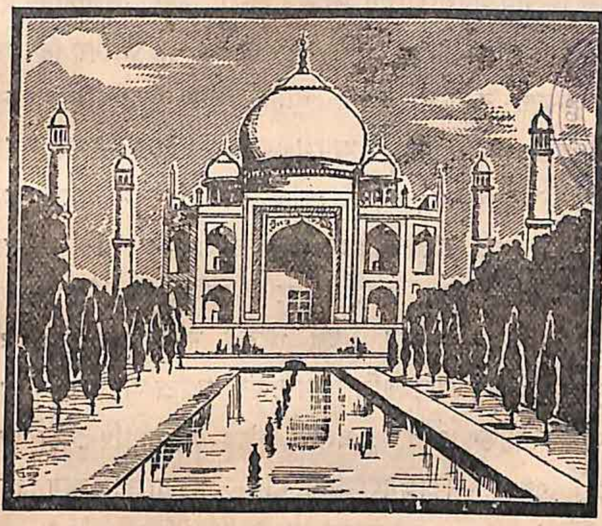
১। শাহ্‌জাহান কিভাবে রাজ্যাধিকার করেন?
২। শাহ্‌জাহানের জাঁকজমকপ্রিয়তার বর্ণনা দাও।
৩। তাজমহল কার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল?
৪। শাহ্‌জাহানের শেষজীবন সম্বন্ধে যা' জান বল।



শাহ্‌জাহানের ময়ূরসিংহাসন

আমলে নির্মিত। দিল্লীর নিকটে নিজের নামানুসারে তিনি শাহ্‌জাহানাবাদ নামে একটি নূতন শহর নির্মাণ করান।

শাহ্‌জাহান সম্রাট্ হলেও তাঁর মনটি ছিল শিল্পীর মন। তাই সর্বপ্রকারের সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর সহজাত অনুরাগ ছিল। জগদ্বিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসন শাহ্‌জাহানের অপূর্ব কীর্তি। এই সিংহাসনের চারিটি পায়া সোনার তৈরী। এতে বহু মূল্যবান মণিমাণিক্যখচিত বারোটি থাম ছিল; প্রত্যেক থামের উপরে



তাজমহল

দুইটি করে ময়ূর-মূর্তি ছিল। শোনা যায় এই সিংহাসন তৈরী করতে নাকি আট বছর সময় লেগেছিল। এটি এখন আর ভারতবর্ষে নেই। পারস্যের রাজা নাদির শাহ্ দিল্লী আক্রমণ ক'রে ওটিকে পারস্যে নিয়ে যান।

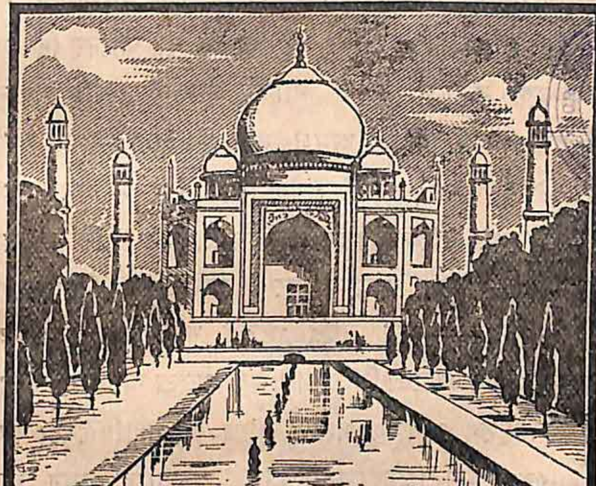
TRAINING CO... BANIPUR



শাহ্‌জাহানের ময়ূরসিংহাসন

আমলে নির্মিত। দিল্লীর নিকটে নিজের নামানুসারে তিনি শাহ্‌জাহানাবাদ নামে একটি নূতন শহর নির্মাণ করান।

শাহ্‌জাহান সম্রাট্ হলেও তাঁর মনটি ছিল শিল্পীর মন। তাই সর্বপ্রকারের সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর সহজাত অনুরাগ ছিল। জগদ্বিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসন শাহ্‌জাহানের অপূর্ব কীর্তি। এই সিংহাসনের চারিটি পায়া সোনার তৈরী। এতে বহু মূল্যবান মণিমাণিক্যখচিত বারোটি থাম ছিল; প্রত্যেক থামের উপরে



তাজমহল

দুইটি করে ময়ূর-মূর্তি ছিল। শোনা যায় এই সিংহাসন তৈরী করতে নাকি আট বছর সময় লেগেছিল। এটি এখন আর ভারতবর্ষে নেই। পারস্যের রাজা নাদির শাহ্ দিল্লী আক্রমণ ক'রে ওটিকে পারস্যে নিয়ে যান।

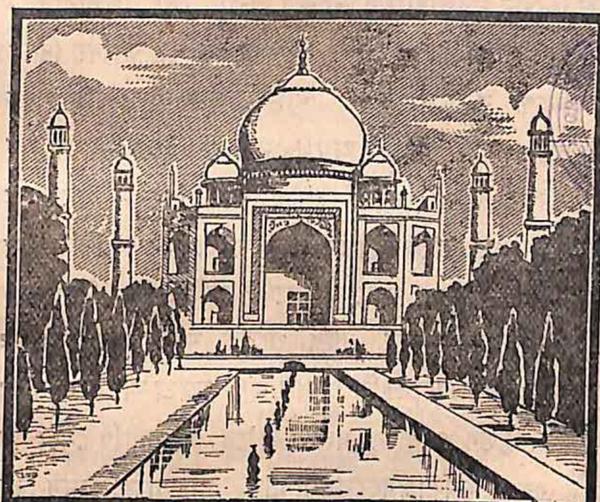
TRAINING CO... ...BANIPUR.



শাহ্‌জাহানের ময়ূরসিংহাসন

আমলে নির্মিত। দিল্লীর নিকটে নিজের নামানুসারে তিনি শাহ্‌জাহানাবাদ নামে একটি নূতন শহর নির্মাণ করান।

শাহ্‌জাহান সম্রাট্‌ হলেও তাঁর মনটি ছিল শিল্পীর মন। তাই সর্বপ্রকারের সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর সহজাত অনুরাগ ছিল। জগদ্বিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসন শাহ্‌জাহানের অপূর্ব কীর্তি। এই সিংহাসনের চারিটি পায়া সোনার তৈরী। এতে বহু মূল্যবান মণিমাণিক্যখচিত বারোটি থাম ছিল; প্রত্যেক থামের উপরে



তাজমহল

দুইটি করে ময়ূর-মূর্তি ছিল। শোনা যায় এই সিংহাসন তৈরী করতে নাকি আট বছর সময় লেগেছিল। এটি এখন আর ভারতবর্ষে নেই। পারস্যের রাজা নাদির শাহ্‌ দিল্লী আক্রমণ ক'রে ওটিকে পারস্যে নিয়ে যান।

TRAINING CO... BANIPUR.

সপ্তম অধ্যায়

ঔরংজীব ও মোগল সাম্রাজ্যের পতন

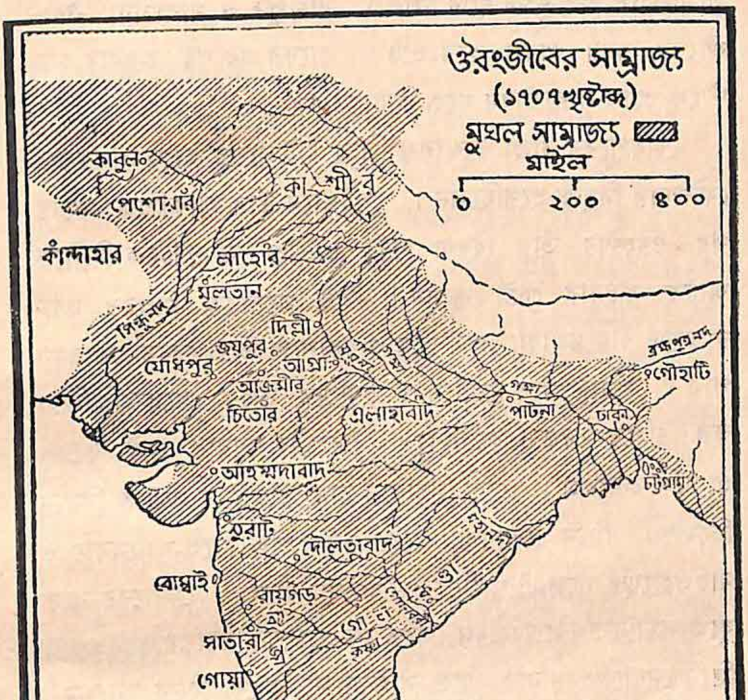
সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ **দারা শিকো** ছিলেন সব চেয়ে সচ্চরিত্র, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের সুবাদার, দ্বিতীয় পুত্র **সুজা** ছিলেন বাংলা দেশের সুবাদার। সুজা অত্যন্ত ভোগবিলাসী ছিলেন। তৃতীয় পুত্র **ঔরংজীব** ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা এবং **মুরাদ** গুজরাটের।

শাহ্‌জাহানের ইচ্ছা ছিল দারা শিকোই সম্রাট্ হন। কিন্তু তা' হলো না। ভাইদের যুদ্ধে পরাজিত কিংবা কৌশলে হত্যা ক'রে পিতাকে বন্দী ক'রে ঔরংজীব দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। তখ তাঁর উপাধি হলো 'আলমগীর' বা বিশ্ববিজয়ী।



ঔরংজীব

ঔরংজীবের রাজ্যবিস্তার—বাদশাহ্ হয়েই ঔরংজীব রাজ্য-বিস্তার ও শাসন-সংস্কারে মনো-যোগ দিলেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানেরা এই সময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। প্রবল যুদ্ধের দ্বারা ঔরংজীব এই বিদ্রোহীদের দমন ক'রে বিজাপুর ও

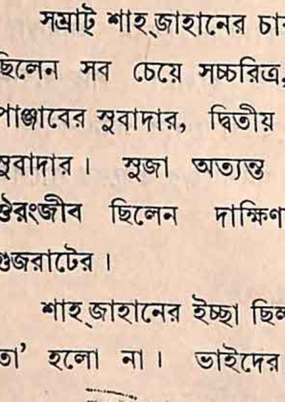

ঔরংজীবের সাম্রাজ্য
(১৭০৭ খৃষ্টাব্দ)
মুঘল সাম্রাজ্য
মাইল
০
২০০
৪০০
কাবুল
পেশোয়ার
কাশ্মীর
কান্দাহার
লাহোর
মুলতান
সিন্ধুনদ
দিল্লী
জয়পুর
যোধপুর
আগ্রা
আজমীর
চিতোর
এলাহাবাদ
গঙ্গা
পাটনা
ব্রহ্মপুত্র নদ
গৌহাটি
ঢাকা
চট্টগ্রাম
আহম্মদাবাদ
সুরাট
দৌলতাবাদ
বোম্বাই
রায়গড়
সাতারা
গোয়া
কৃষ্ণা
কালিকট
তাঞ্জোর
মাদুরা

সপ্তম অধ্যায়

ঔরংজীব ও মোগল সাম্রাজ্যের পতন

সম্রাট শাহ্‌জাহানের চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দারা শিকো ছিলেন সব চেয়ে সচ্চরিত্র, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের সুবাদার, দ্বিতীয় পুত্র সুজা ছিলেন বাংলা দেশের সুবাদার। সুজা অত্যন্ত ভোগবিলাসী ছিলেন। তৃতীয় পুত্র **ঔরংজীব** ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা এবং **মুরাদ** গুজরাটের।

শাহ্‌জাহানের ইচ্ছা ছিল দারা শিকোই সম্রাট হন। কিন্তু তা' হলো না। ভাইদের যুদ্ধে পরাজিত কিংবা কৌশলে হত্যা ক'রে পিতাকে বন্দী ক'রে ঔরংজীব দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। তখ তাঁর উপাধি হলো 'আলমগীর' বা বিশ্ববিজয়ী।


ঔরংজীব

ঔরংজীবের রাজ্যবিস্তার— বাদশাহ্‌ হয়েই ঔরংজীব রাজ্য-বিস্তার ও শাসন-সংস্কারে মনোযোগ দিলেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানেরা এই সময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। প্রবল যুদ্ধের দ্বারা ঔরংজীব এই বিদ্রোহীদের দমন ক'রে বিজাপুর ও



ঔরংজীবের সাম্রাজ্য
(১৭০৭খৃষ্টাব্দ)
মুঘল সাম্রাজ্য
মাইল
০ ২০০ ৪০০
কাবুল
পেশোয়ার
কান্দাহার
লাহোর
মুলতান
সিন্ধুনদ
দিল্লী
জয়পুর
যোধপুর
আগ্রা
আজমীর
চিতোর
এলাহাবাদ
পাটনা
ঢাকা
গৌহাটি
ব্রহ্মপুত্র নদ
চট্টগ্রাম
আহম্মদাবাদ
সুরাট
দৌলতাবাদ
বোম্বাই
রায়গড়
সাতারা
গোয়া
কৃষ্ণা
ক্যালিকট
তাঞ্জোর
মাদুরা

গোলকুণ্ডা জয় করলেন। প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ঔরংজীবের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে চলল। রাজপুত ও মারাঠারা ঔরংজীবের সময় প্রবল হয়ে ওঠে। তাদের গর্ব খর্ব করবার জন্য তাঁকে প্রায় সারাজীবন যুদ্ধে কাটাতে হয়।

যোধপুরের রাজা **যশোবন্ত সিংহ** খাইবারের কাছে জামরুদের ফৌজদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেইখানে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর ঔরংজীব তাঁর বিধবা পত্নী ও শিশু পুত্র দু'টিকে দিল্লীতে আটক করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যশোবন্ত সিংহের ভক্ত রাজপুত বীর দুর্গাদাসের বীরত্বে ও কৌশলে তাঁরা কোনমতে রক্ষা পান। সম্রাট্ আকবরের সময় হিন্দুদের উপর থেকে জিজিয়া কর উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঔরংজীব আবার সেই করের প্রবর্তন করলেন। এতে মেবারের রানা রাজসিংহ অত্যন্ত বিরক্ত ছিমেল। তিনি যশোবন্ত সিংহের পত্নীর পক্ষ নিলেন। মেবার ও মারওয়াড়ের সঙ্গে ঔরংজীবের ভীষণ যুদ্ধ বাধল। মেবারের সঙ্গে যুদ্ধে সম্রাট্‌কে বিশেষ বেগ পেতে হয়; কয়েক বছরের যুদ্ধের পর তিনি মেবারের রানার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন ক'রে ফিরে আসেন। আর মারওয়াড়ের সঙ্গে তাঁকে প্রায় ত্রিশ বছর যাবৎ যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

ওদিকে দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর অধীনে মারাঠা জাতি ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের দমন করবার জন্য ঔরংজীব দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হলেন। এই সব যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য ঔরংজীবকে শেষজীবন দাক্ষিণাত্যে কাটাতে হয়। কিন্তু তবুও তিনি মারাঠাদের দমন করতে পারলেন না। বরঞ্চ তাঁর মৃত্যুর

পর এই মারাঠা জাতিই ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে মোগল-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল।

ঔরংজীবের অত্যাচারে ও কঠোর শাসনের ফলে পাঞ্জাবের শিখ জাতিও তাঁর উপর বিরূপ হয়ে ওঠে। শিখ সম্প্রদায়ের গুরু **তেগবাহাদুর** সম্রাটের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেন। ফলে তিনি বন্দী হলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো যে তিনি ধর্ম দিতে রাজী না প্রাণ দিতে রাজী। তেগবাহাদুর সগর্বে উত্তর দিলেন যে তিনি 'শির' অর্থাৎ মাথা দিতে রাজী কিন্তু 'সার' বা ধর্ম দিতে রাজী নন। এই স্পর্ধিত জবাবের ফলে বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হলো। তেগবাহাদুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **গুরু গোবিন্দ সিংহ** আবার শিখদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন।

মথুরায় জাঠ জাতি এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফ্রিদি প্রভৃতি দুর্ধর্ষ জাতিও ঔরংজীবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এদের দমন করতে দীর্ঘকাল যুদ্ধ ক'রে সম্রাট্‌কে অনেক শক্তি ক্ষয় করতে হয়। শেষে দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ঔরংজীবের মৃত্যু হয়।

চরিত্র—মানুষ হিসাবে ঔরংজীব ছিলেন দোষে-গুণে মেশানো। হিন্দু প্রজারা তাঁকে প্রবল অত্যাচারী বাদশাহ্‌ মনে করত; আবার মুসলমানগণ মনে করত ধর্মনিষ্ঠ আদর্শ বাদশাহ্‌। ঔরংজীব দুনিয়ার কাউকেই বিশ্বাস করতেন না,—এমনকি নিজের সন্তানগণ ও দায়িত্বশীল সেনাপতিকে পর্যন্ত না। ফলে তিনি জীবনে কারও শ্রদ্ধা-প্রীতি লাভ করতে

পারেননি। কোন সুকুমার শিল্পকলার প্রতিই তাঁর অনুরাগ ছিল না। ফলে তিনি সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি কোনরূপ শিল্পেরই পৃষ্ঠপোষকতা করেননি। তাঁর আদেশে রাজ্যে সঙ্গীত-চর্চা ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ নিষিদ্ধ হয়। ঔরংজীব যে শুধু হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন তাই নয়, নিজে 'সুন্নি' সম্প্রদায়ের মুসলমান বলে 'শিয়া' সম্প্রদায়ের মুসলমানদেরও তিনি দেখতে পারতেন না। তবে ব্যক্তিগত জীবনে ঔরংজীব ছিলেন অনাড়ম্বর নিষ্ঠাবান মুসলমান। ইসলাম ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলি তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। তিনি মদ স্পর্শ করেননি, এবং এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও নমাজপাঠ বন্ধ করতেন না। তিনি নিজের হাতে টুপি সেলাই করতেন এবং কোরান-শরিফ্ নকল করে বিক্রি করতেন।

মোগল-সাম্রাজ্যের পতন—ঔরংজীবের সময়েই মোগল-সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল, আবার তাঁর সময়েই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়। তাঁর মৃত্যুর ৩০ বছরের মধ্যেই মোগল-সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। তাঁর শাসন-নীতিতে এমন কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি ছিল যা' তাঁর জীবদ্দশাতেই মোগল-সাম্রাজ্যে ভাঙন ডেকে আনে। এই সমস্ত ত্রুটির মধ্যে ধর্মবিষয়ে অনুদার নীতিই প্রধান। আকবর মনে করতেন যে প্রজাপুঞ্জের সম্মিলিত সদিচ্ছার উপরেই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। তাই তিনি হিন্দুদের প্রতি সদয় ও উদার ব্যবহার করতেন। আর ঔরংজীব এই নীতি মানতেন না; তিনি ছিলেন অস্ত্রবলে বিশ্বাসী। তাঁরই আদেশে কাশী, মথুরা,

উজ্জয়িনীর হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করা হয়; রাজ্যশাসন ব্যাপারে হিন্দুদের কোন স্থান ছিল না। ঔরংজীব আবার হিন্দুদের উপর কুখ্যাত 'জিজিয়া' করের প্রবর্তন করেন। এইজন্যে মারাঠা, রাজপুত, শিখ প্রভৃতি হিন্দুরা ঔরংজীবের বিরোধী হয়ে ওঠে। আকবর তাঁর সুমধুর ব্যবহারের দ্বারা হিন্দু প্রজাদের হৃদয় জয় ক'রে মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় করেছিলেন, কিন্তু ঔরংজীব রূঢ় ব্যবহারের দ্বারা হিন্দুদের শত্রুতে পরিণত করেন।

ঔরংজীবের বংশধরদের অযোগ্যতাও মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের আর একটি কারণ। এদের আমলে রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কর্মচারীগণ প্রবল হয়ে ওঠেন, ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সময়ে পারস্য-রাজ **নাদির শাহ্** ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। নাদির অনায়াসে মোগল সৈন্যদের পরাজিত ক'রে দিল্লী অধিকার করলেন এবং রাশি রাশি ধন-রত্ন লুণ্ঠন ক'রে দেশে ফিরে গেলেন। নাদিরের আক্রমণের পরে মোগল সাম্রাজ্যের যা' কিছু অবশিষ্ট ছিল, কাবুলের সুলতান **আহ্‌মদ শাহ্ দুরানীর** বারংবার আক্রমণে তা' একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। তা' ছাড়া সেকালে পথঘাটের অবস্থা ভালো ছিল না। ফলে এই স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত একেবারেই সহজসাধ্য ছিল না। রাজ্যের এক প্রান্তে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে অন্য প্রান্ত থেকে সেখানে গিয়ে প্রতিকার করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। বিশাল মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের মূলে এই সমস্ত কারণও বিদ্যমান ছিল।

আহ্‌মদ শাহ্‌ তুরানীর আক্রমণের পরেও সম্রাট-উপাধিধারী কয়েকজন দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন বটে, তবে আসলে তাঁরা ছিলেন নামেই সম্রাট্‌, তাঁদের বিশেষ কোন ক্ষমাতাই ছিল না।

মনে রেখো

১৬৫৮—১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে—ঔরংজীবের রাজত্বকাল
১৬৭৫ ,, —তেগবাহাদুরের প্রাণদণ্ড
১৬৭৯ ,, —জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন
১৭০৭ ,, —ঔরংজীবের মৃত্যু
১৭৩৯ ,, —নাদির শাহের ভারত আক্রমণ

অনুশীলনী

১। ঔরংজীব কিবাবে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন?
২। ঔরংজীবের রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে কী জান বল?
৩। ঔরংজীবের চরিত্রে কি কি গুণ ও দোষ ছিল?
৪। আকবর ও ঔরংজীবের মধ্যে তুলনায় কাকে বড় মনে হয়?
৫। মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সবিস্তারে বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

শিবাজী ও মারাঠা শক্তির উত্থান

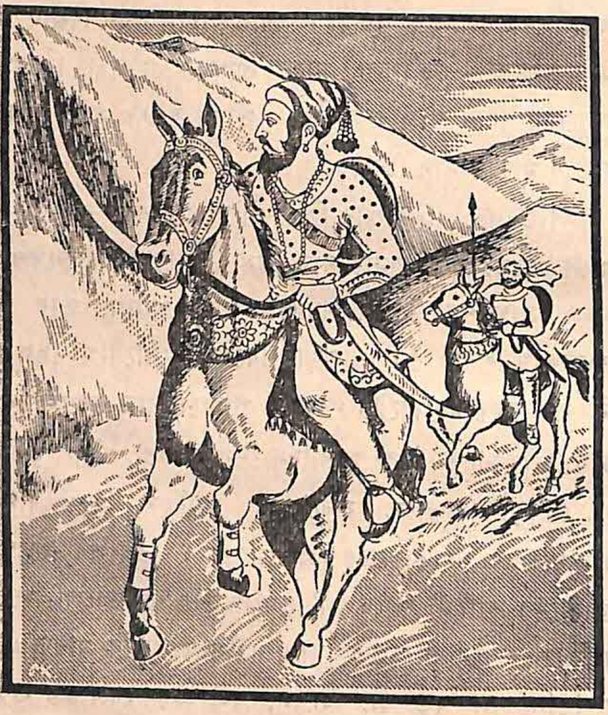
দাক্ষিণাত্যে 'মহারাষ্ট্র' নামে একটি প্রদেশ আছে। ওখানকার অধিবাসীদের বলা হয় মারাঠা। শাহ্‌জাহান যখন দিল্লীর সম্রাট্ তখন শাহ্‌জী ভোঁসলা নামে একজন মারাঠা বিজাপুরের সুলতানের অধীন কাজ করতেন। তাঁরই পুত্রের নাম **শিবাজী**। শিবাজীর মাতার নাম জিজাবাঈ।

বাল্যজীবন—শিবাজীর পিতা বিদেশে চাকরি করতেন বলে শিবাজী মায়ের সঙ্গে পুনায় থাকতেন। দাদাজী কাহ্ণদেও নামে একজন ব্রাহ্মণের উপর শিবাজীর দেখাশোনার ভার ছিল। ছেলেবেলায় শিবাজীর লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ ছিল না। তিনি সব সময় মহারাষ্ট্রের পাহাড়ে পাহাড়ে বনে-জঙ্গলে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতেন এবং সারাদিন শিকার করা, তীর ধনুক ও বর্শা ছোঁড়া অভ্যাস করতেন। বাড়ীতে ফিরে দাদাজীর মুখে রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনতেন। এই সব গ্রন্থে যে সমস্ত বীরের কাহিনী আছে তা' শুনতে তাঁর খুব ভালো লাগত। তাঁর কিশোর মনে ভবিষ্যতের নানা রঙীন স্বপ্ন উঁকি মারত। বড় হলে তিনি মস্ত বড় বীর হবেন, যুদ্ধ করে দেশ জয় করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ঐ পাহাড়ী অঞ্চলে 'মাওয়ালী' নামে এক দুর্ধর্ষ কষ্টসহিষ্ণু জাতি বাস করত। শিবাজী এই মাওয়ালী জাতির

অনেকগুলি লোক নিয়ে একটি দল গড়ে তুললেন এবং নিজে হলেন সেই দলের নেতা। শিবাজীর নেতৃত্বে মাওয়ালীরা যুদ্ধবিদ্যা শিখে এক শক্তিশালী সৈন্যদলে পরিণত হলো।

বিজাপুরের সঙ্গে বিরোধ—এই সময় বিজাপুর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অবস্থা বুঝে শিবাজী এই মাওয়ালী সৈন্য



শিবাজী

নিয়ে বিজাপুর আক্রমণ করে কয়েকটি দুর্গ দখল করে নিলেন। তখন শিবাজীর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। এই ঘটনায় সুলতান

রাগে ও ক্ষোভে শাহ্‌জীকে বন্দী করলেন। পিতার বন্দী-দশার কথা স্মরণ করে শিবাজী আর অগ্রসর হতে পারলেন না এবং পরে বুদ্ধি-কৌশলে পিতাকে মুক্ত করে আনলেন।

কিছুদিন পরেই আবার শিবাজী দৌরাত্ম্য শুরু করলেন। সুলতান এই ঔদ্ধত্য আর সহ্য করতে পারলেন না; একদল সৈন্যসহ সেনাপতি **আফজল খাঁকে** পাঠিয়ে দিলেন শিবাজীকে দমন করবার জন্য। শিবাজী তখন প্রতাপগড় দুর্গে। তিনি যুদ্ধ না ক'রে এক সন্ধির প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন। আফজল খাঁ সম্মত হলেন। স্থির হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে উভয়ে সাক্ষাৎ করে সন্ধির সর্ত আলাপ-আলোচনা করবেন। সেই রকম ব্যবস্থাই করা হলো। কিন্তু শিবাজীকে নির্জন স্থানে পেয়েই আফজল খাঁ আক্রমণ করে বসলেন। শিবাজী এই আচরণে বিস্মিত বা বিচলিত হলেন না। তিনি তাঁর 'বাঘনখ' নামক অস্ত্রের সাহায্যে আফজল খাঁকে হত্যা করে ফেললেন। ভয়ে আফজলের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তখন বিজাপুরের সুলতানকে বাধ্য হয়ে শিবাজীর সঙ্গে সন্ধি করতে হলো।

ঔরংজীবের সঙ্গে বিরোধ—ক্রমেই শিবাজীর সাহস ও শক্তি বাড়তে লাগল। এবার তিনি মোগল সাম্রাজ্যে হানা দেওয়া আরম্ভ করলেন। তখন দিল্লীর সম্রাট্ ঔরংজীব। তিনি সেনাপতি **শায়েস্তা খাঁকে** পাঠালেন শিবাজীকে দমন করবার জন্য। এই সংবাদ জানতে পেরে তিনি পুনা ছেড়ে চলে গেলেন এবং শায়েস্তা খাঁ নির্বিবাদে শিবাজীর বাড়ী দখল ক'রে বসলেন। ভাবলেন শিবাজী ভয়ে পালিয়েছে। কিন্তু তিনি কোন অবস্থাতেই

ভয় পাবার লোক ছিলেন না। সুযোগ বুঝে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে নিয়ে শিবাজী কৌশলে এক বরযাত্রীদলের সঙ্গে মিশে পুনায় এসে উপস্থিত হলেন। তারপর রাত দুপুরে শায়েস্তা খাঁ যখন আরামে ঘুমোচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁর ঘরে ঢুকে অতর্কিতে তাঁকে আক্রমণ ক'রে বসলেন। বেগতিক দেখে শায়েস্তা খাঁ জানালা দিয়ে লাফ মেরে পালিয়ে গেলেন। যাবার সময় শিবাজীর তলোয়ারের আঘাতে তাঁর হাতের একটি আঙ্গুল কেটে পড়ে গেল।

এই সময় থেকে শিবাজী প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাজার মতো চলতে লাগলেন। এই সংবাদ জানতে পেরে ঔরংজীব তাঁকে দমন করবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। তারপর জয়সিংহ ও দিলির খাঁকে পাঠালেন শিবাজীকে শায়েস্তা করবার জন্য। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে শিবাজী এঁদের সঙ্গে সন্ধি করলেন। তাঁকে কিছু পরিমাণে ঔরংজীবের অধীনতা বরণ করতে হলো। এই সময় ঔরংজীব শিবাজীকে ডেকে পাঠালেন। জয়সিংহ আশ্বাস দিলেন যে বাদশাহের দ্বারা তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। তখন শিবাজী তাঁর পুত্র শম্ভুজীকে নিয়ে আগ্রায় গেলেন।

আগ্রায় যাওয়ামাত্র ঔরংজীব তাঁদের বন্দী করলেন। শিবাজী ঔরংজীবের এই বিশ্বাসঘাতক আচরণে মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু মুখে কিছু না বলে তিনি মুক্তির উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। অল্পদিন পরেই সহসা প্রচারিত হলো যে শিবাজী খুব অসুস্থ। রোগ আরোগ্যের জন্য তিনি

প্রতিদিন দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও রাজকর্মচারিদের মধ্যে ঝুড়ি ঝুড়ি ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করতে লাগলেন। প্রথম প্রথম বাদশাহের কর্মচারিরা ঝুড়িগুলি পরীক্ষা ক'রে তবে ছেড়ে দিত। শেষে আর পরিক্ষা করা হতো না। এই সময় সুযোগ বুঝে শিবাজী ও শম্ভুজী দু'জনে দু'টি মিষ্টান্নের ঝুড়িতে ব'সে আগ্রা দুর্গ থেকে বাহিরে পালিয়ে এলেন। কেউ ধরতে পারলে না, সকলে মনে করল মিষ্টান্নের ঝুড়িই যাচ্ছে।

রাজ্যাভিষেক—নিজের রাজ্যে ফিরে এসে শিবাজী প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করা শুরু করলেন। তিনি, মোগল-সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশে 'চৌথ' আদায় ও লুটপাট আরম্ভ করে দিলেন। ঔরংজীব আর তাঁকে দমন ক'রে উঠতে পারলেন না। তখন তিনি শিবাজীকে 'রাজা' বলে স্বীকার ক'রে নিয়ে সন্ধি করলেন। রায়গড়ে মহাসমারোহে তাঁর অভিষেক হয়ে গেল। তখন শিবাজীর উপাধি হলো **মহারাজা** বা **ছত্রপতি**। তারপর বহু দেশ জয়ের ফলে শিবাজীর রাজ্য হলো সুদূরবিস্তৃত। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মারাঠা জাতির হলো নবজন্ম। ছয় বছর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করবার পর পঞ্চাশ বছর বয়সে শিবাজীর মৃত্যু হয়।

চরিত্র—শিবাজী পরধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না। হিন্দু ও মুসলমান প্রজাগণকে তিনি সমান চক্ষে দেখতেন। কখনও তাঁর হাতে কোন মসজিদ অপবিত্র হয়নি। বরঞ্চ মুসলমান প্রজাদের জন্য তিনি মসজিদ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। এইজন্য মুসলমান লেখক **কাফি খাঁ** তাঁর চরিত্রের যথেষ্ট প্রশংসা ক'রে

গেছেন। জননীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল অগাধ। কখনও বিপদে-আপদে পড়লে তিনি জননীর পরামর্শ নিতে ভুলতেন না।

শাসন-ব্যবস্থা—শিবাজী শুধু যে রণ-বিশারদ ছিলেন তা' নয়। তাঁর শাসন-বাবস্থাও সুশৃঙ্খল ছিল। তাঁর আটজন মন্ত্রী ছিল তিনি তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তবে কোন কাজ করতেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য শিবাজী তাঁর রাজ্য কয়েকটি 'প্রান্ত' বা প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। উৎপন্ন শস্যের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ রাজকররূপে নেওয়া হতো। এ ছাড়া তিনি **'চৌথ'** ও **'সরদেশীমুখী'** নামে আরো দুইটি কর আদায় করতেন। শিবাজীর সৈন্য-বিভাগেও ছিল সুনিয়ন্ত্রিত। তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যারা সরকারী তহবিল থেকে অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ পেত তাদের বলা হতো 'বারগীর'। পরে বারগীরদের বাংলায় বলা হতো বর্গী। যারা নিজেরা অস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণাদি সংগ্রহ করে যুদ্ধ করতো তাদের বলতো 'শিলাদার'।

মারাঠা-সাম্রাজ্য—শিবাজীর মৃত্যুর পরেও মারাঠারা তাঁর আদর্শ ভুলে যায়নি। তাঁর পুত্র শম্ভুজী ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হন। কিন্তু ঔরংজীব বহুকাল যুদ্ধ করেও মারাঠা জাতিকে বশে আনতে পারেননি। শাহজীর পুত্র শাহুর রাজত্বকালে মারাঠাদের শাসনাধিকার মন্ত্রীদের হাতে চলে যায়। এই মন্ত্রীদের বলা হতো **'পেশোয়া'**। পেশোয়া বাজীরাও ও বালাজী বাজীরাওয়ের আমলে মারাঠা সাম্রাজ্য

চরম উন্নতির শিখরে ওঠে। পরে ইংরেজদের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধের ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

মনে রেখো

১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে—শিবাজীর জন্ম
১৬৬৪ „ —শিবাজীর রাজা উপাধি গ্রহণ
১৬৭৪ „ —শিবাজীর রাজ্যাভিষেক
১৬৮০ „ —শিবাজীর মৃত্যু

অনুশীলনী

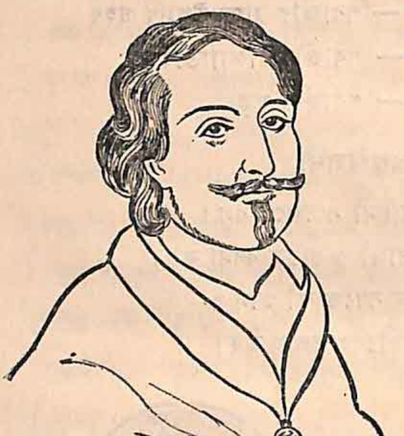
১। শিবাজীর জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে বল।
২। শিবাজীর শাসন-প্রণালী ও চরিত্র বর্ণনা কর।
৩। মারাঠা-শক্তির উত্থান সম্বন্ধে কী জান?
৪। শিবাজীর সঙ্গে ঔরংজীবের তুলনা কর।

OR BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR

নবম অধ্যায়

মোগলযুগে জীবনযাত্রা

মোগল সম্রাট্‌দের শাসনকালে বিদেশ থেকে অনেক পর্যটক ভারত-ভ্রমণে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে ফরাসী পর্যটক **বার্ণিয়ে ও তাভার্ণিয়ে,** এবং ইংরেজ রাজদূত **হকিন্স** এবং **স্যার টমাস রো**-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের লিখিত বিবরণী থেকে সেই সময়কার দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারা যায়।


স্যার টমাস রো

ভারতের ঐশ্বর্যের কথা চিরকালই বিদেশের লোকদের কাছে কল্পনার বিষয় ছিল। সেই ঐশ্বর্যের লোভে বিভিন্ন কালে বিদেশীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে। মোগল শাসনকালে ভারতের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়েই য়ুরোপীয় বণিকেরা ভারতে বাণিজ্য করতে আসে।

বিদেশী লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে সেকালের ভারতীয় সমাজ—জমিদার, ব্যবসায়ী এবং গরীব,—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ধনী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে গরীব জনসাধারণের জীবনযাত্রার চরম পার্থক্য ছিল। জমিদারগণ

প্রায়ই বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে দিনযাপন করতেন। ব্যবসায়িগণ সাধারণতঃ ছিলেন মিতব্যয়ী। অর্থ সঞ্চয়ের দিকে তাঁদের ছিল সতর্ক দৃষ্টি। কেবলমাত্র গরীব জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। বাদশাহের কর্মচারীরা গরীব কৃষক ও মজুরদের উপর নানাভাবে অত্যাচার, উৎপীড়ন করত। দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধলে তখন লোকের দুঃখ-কষ্টের অন্ত থাকত না। দেশে মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। তখন গরীব লোকেরা পেটের দায়ে নিজেদের ছেলেমেয়ে পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হতো। তখন যানবাহন ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত ছিল না। সে কারণ দুর্ভিক্ষের সময় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় খাদ্য চালান দেওয়া সম্ভব হতো না। সম্রাট্ শাহজাহানের রাজত্বকালে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই দুর্ভিক্ষে বহু লোক মারা গিয়াছিল। তবে গ্রামের লোকের তুলনায় শহরের লোকের আর্থিক অবস্থা অনেকটা ভালো ছিল বলে মনে হয়।

সে আমলের শাসন-ব্যবস্থা ছিল অনেকটা শহরকেন্দ্রিক। গ্রামাঞ্চলের লোকেদের নিরাপত্তার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। গ্রামে গ্রামে **পঞ্চায়েত-প্রথা** ছিল। পঞ্চায়েতরা অনেক সময় গ্রামবাসীদের মধ্যকার বিবাদের বিচার করতেন এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন।

ফরাসী পর্যটক **বার্ণিয়ে** বাংলা দেশের অর্থসম্পদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে গেছেন। বাংলা দেশ থেকে নানাস্থানে ধান ও চিনি চালান যেত। বাংলার রেশমী ও সুতার বস্ত্র তখন

জগদ্বিখ্যাত ছিল। ঔরংজীবের রাজত্বকালে শায়েস্তা খাঁ যখন বাংলার শাসনকর্তা, তখন বাংলায় টাকায় আট মণ ক'রে চাল বিক্রি হতো।

মোগল আমলে শিল্প ও বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। মোগল সম্রাটগণই এদেশের কাগজ, সতরঞ্চ, গালিচা, আতর, গোলাপজল প্রভৃতির প্রচলন করেন। তাঁহাদেরই উৎসাহে এদেশে ঐ সব দ্রব্য প্রস্তুত আরম্ভ হয়। সে সময় লাহোরের শাল, ফতেপুর-সিক্রির গালিচা, গুজরাটের কার্পাসের কাপড় এবং ঢাকার 'মসলিন' বিখ্যাত ছিল।

মোগল আমলে স্থাপত্য শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। তাজমহল, মোতি মসজিদ, জুম্মা মসজিদ, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর ইমারতগুলি এর বিশিষ্ট নিদর্শন।

সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা ও জ্ঞানচর্চারও মোগল আমলে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। সম্রাট আকবর নিজে লেখাপড়া না জানলেও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তার ফলে বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি তাঁর রাজসভায় মর্যাদার সঙ্গে স্থান পেয়েছিলেন। ফারসী ভাষায় লেখা 'জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী' একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। শাহ্‌জাহানের পুত্র দারা অনেক গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন এবং অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব কবি এই যুগে আপন আপন সাধনার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। এই যুগে তুকারামের দ্বারা মারাঠা ভাষার এবং তুলসীদাসের দ্বারা হিন্দী ভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

মোগল আমলে স্থলপথে দস্যুভয় ছিল বেশী। জলপথে পর্তুগীজরা দস্যুতা করত। এই দস্যুতার ভয়ে লোকে ধন সঞ্চয়ের জন্য বিশেষ আগ্রহ পোষণ করত না। পথে-ঘাটে দস্যুদের ভয়ে লোকে সাধারণতঃ তীর্থযাত্রা ছাড়া অন্য কোন কারণে বিদেশে যেতে চাইত না।

অনুশীলনী

১। মোগল-সাম্রাজ্যের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সাধারণভাবে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। মোগলযুগের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাদের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল?

৩। মোগল আমলে শিল্প ও সাহিত্যের কিরূপ উন্নতি হয়েছিল?

দশম অধ্যায়

য়ুরোপীয় বণিকগণ—বাংলার বয়ন-শিল্প

অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে য়ুরোপের বাণিজ্য-সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। যদিও রেল-স্টিমার-এরোপ্লেন আবিষ্কারের পূর্বে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, তবুও জানা যায় যে প্রায় দুই হাজার বছর আগেও ভারতবর্ষে উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্য সুদূর রোমক সাম্রাজ্যে বিক্রি হতো। ভারতের মসলা, কাপড়-চোপড় প্রভৃতির য়ুরোপে বিশেষ সমাদর ছিল। কালক্রমে ভারতের এই বহির্বাণিজ্য আরবদের একচেটিয়া হইয়া পড়ে। আরবদের এই অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা য়ুরোপীয় বণিকদের মনে লোভের সঞ্চার করে। কিন্তু তখন স্থলপথে য়ুরোপ মহাদেশ থেকে ভারতে আসা একান্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল; তাই জলপথ আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু হয়। য়ুরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগীজরাই এই প্রচেষ্টায় প্রথম সাফল্য লাভ করে।



ভাস্কো-ডা-গামা

আমেরিকা-আবিষ্কারক **কলম্বাস** ভারতবর্ষে আসবার জলপথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যেই স্পেন দেশ থেকে যাত্রা করেছিলেন।

ঘটনাক্রমে তিনি ভারতবর্ষ আবিষ্কার করতে না পারলেও এক নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করে বসেন। তারপর ভাস্কো-ডা-গামা নামে একজন পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকা মহাদেশ বেষ্টন করে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে 'কালিকট' বন্দরে এসে উপস্থিত হন। ভাস্কো-ডা-গামার এই আবিষ্কারের পর পর্তুগীজ বণিকেরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়। ধীরে ধীরে পর্তুগীজেরা বেসিন, গোয়া, এমন, দিউ, চৌল, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং বাংলাদেশে হুগলী প্রভৃতি অনেকগুলি জায়গায় কুঠি স্থাপন করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। সম্রাট্ শাহ্ জাহানের সময় হুগলীর পর্তুগীজ কুঠি ধ্বংস করা হয়।

ভাস্কো-ডা-গামার ভারতে আগমনের একশ' বছরের মধ্যে পর্তুগীজদের দেখাদেখি য়ুরোপের অন্যান্য দেশের লোকেরাও ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে আসে। তখন এদেশে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু নানাবিধ কারণে অনেকেই টিকে থাকতে পারল না। অবশেষে ভারতের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল ইংরেজ ও ফরাসী। পরে উভয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে ফরাসীদের প্রভাব প্রতিহত হলো এবং ইংরেজ বণিকেরাই ভারতে সর্বপ্রধান বৈদেশিক শক্তিতে রূপান্তরিত হলো।

ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথ কয়েকজন ইংরেজ বণিককে ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য সনদ দান করেন। এই বণিকেরা মিলিত হয়ে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে এক বণিক-সমিতি গঠন করে। দেড়শ' বছর পরে এই কোম্পানীই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল।

তৈরি করতে পারত না। ফলে ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ে বাংলার বাজার ছেয়ে গেল। পরাধীন বাঙালী জাতি দেশী কাপড়ের পরিবর্তে বিলাতী কাপড় পরতে বাধ্য হলো।

মনে রেখো

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে—য়ুরোপীয় বণিকদের ভারতে আগমন
১৬১৫-১৮ " —স্যার টমাস রো-র দৌত্য
১৬৩৯ " —মাদ্রাজে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি স্থাপন

অনুশীলনী

১। য়ুরোপীয় বণিকেরা কি উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিল?
২। ভাস্কো-ডা-গামা, স্যার টমাস রো কি জন্য বিখ্যাত?
৩। বাংলার বয়ন-শিল্প সম্বন্ধে কি জান?
৪। বাংলার বয়ন-শিল্প কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল?

একাদশ অধ্যায়

সিরাজউদ্দৌলা ও মীরকাশিম

ঔরংজীবের মৃত্যুর পর মোগল বাদশাহ্‌গণের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক পরিমাণে খর্ব হয়ে গেল। সেই সুযোগে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাগণ আপন আপন প্রাধান্য বিস্তার ক'রে প্রায় স্বাধীন হয়ে বসলেন।

ঔরংজীবের সময় বাংলার দেওয়ান ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। প্রথমে তাঁর রাজধানী ছিল ঢাকায়। তিনি সেই সময়কার বাংলার সুবাদারের সঙ্গে বিবাদ ক'রে তাঁর রাজধানী ঢাকা থেকে গঙ্গাতীরে এক নূতন স্থানে স্থানান্তরিত করলেন। মুর্শিদকুলি খাঁর নামানুসারে এই নূতন স্থানের নাম হলো **মুর্শিদাবাদ**। পরে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। তখন তাঁর উপাধি হলো নবাব।


নবাব সিরাজউদ্দৌলা

মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলার নবাব হন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকাল বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব হলেন। আলিবর্দি খাঁ তখন বিহার-উড়িষ্যার নবাব। কিছুকাল পরেই আলিবর্দি খাঁ সরফরাজ খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত ক'রে বাংলারও নবাব হয়ে বসলেন।

এলিজাবেথের পর ইংলণ্ডের রাজা হয়েছিলেন প্রথম জেমস্। তিনি ভারতে ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য মোগল সম্রাটের দরবারে দূত পাঠিয়েছিলেন। এই দূতের নাম ছিল **স্যার টমাস্ রো**। তাঁর লিখিত বিবরণী থেকে জাহাঙ্গীরের আমলের অনেক কথা জানতে পারা যায়।

ভারতে ইংরেজদের প্রথম বাণিজ্য-কুঠি স্থাপিত হয় সুরাটে। পরে বোম্বাই বন্দর সুরাটের চেয়েও বিখ্যাত বাণিজ্য বন্দরে পরিণত হয়।

বাংলার বয়ন-শিল্প—বাংলা দেশ প্রকৃতপক্ষে বয়ন-শিল্পের জন্মভূমি। এককালে এই শিল্পে বাঙালীর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তখন বিদেশ থেকে বাংলায় কাপড় আমদানির কোন প্রয়োজন হতো না; বরং এদেশের তাঁতীদের তাঁতে তৈরি মিহি সুতী ও রেশমী কাপড় য়ুরোপের নানাদেশের বাজারে উঁচু দামে বিক্রি হতো!

বাংলা দেশের গৃহস্থঘরের মেয়েরা চরকায় সুতা কেটে বিক্রি করত। তাঁতীরা ঐ সুতা কিনে নিয়ে কাপড় তৈরি করত। বিশেষতঃ ঢাকা জেলার বিক্রমপুর এইজন্য বিখ্যাত ছিল। এই অঞ্চলের মেয়েরা এমন মিহি সুতা কাটতে পারতেন, যে সেই সুতায় তৈরি পাঁচ ছয়টি পৈতা একটি বড় এলাচের খোসার মধ্যে স্বচ্ছন্দে ভরে রাখা যেত। তা' ছাড়া **ঢাকাই মসলিন** এক সময়ে সারা পৃথিবীতে সুনাম অর্জন করেছিল। চীন, তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, পারস্য, ইতালী প্রভৃতি দেশে ঢাকাই মসলিন সমাদরের সঙ্গে বিক্রি হতো। এই মসলিনের কাপড় এত পাতলা

ও হাল্কা হতো যে রাত্রিবেলায় তা ঘাসের উপর বিছিয়ে রাখলে শিশিরের জলে ঘাসের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যেত যে সকালে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হতো। মসলিনের কাপড় যেমন ছিল মিহি, তেমনি টেকসই। শোনা যায় জাহাঙ্গীরের আমলে একখানি উৎকৃষ্ট মসলিন ছ'হাজার টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হতো। একবছর একমাত্র ঢাকা শহর থেকেই প্রায় দেড় কোটি টাকার মসলিন বিদেশে রপ্তানি হয়েছিল। ঢাকার পরেই মিহি কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, টাঙ্গাইল, রামজীবনপুর ইত্যাদি স্থান।

মাদ্রাজ প্রদেশে মছলিপত্তন নামে একটি বন্দর আছে। বিদেশীরা সেখান থেকে এই কাপড় য়ুরোপে চালান দিতেন। এই 'মছলিপত্তন' থেকেই 'মসলিন' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে ব'লে মনে হয়।

মোগল আমল পর্যন্ত এই মিহি সুতী ও রেশমী বস্ত্র বয়ন-শিল্পের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিলাতী কাপড়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলার এই বিখ্যাত কুটির-শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে।

ইংলণ্ডের লোক ভারতীয় বস্ত্র পেলে নিজেদের দেশের তৈরি কাপড় পরত না। এতে ইংলণ্ডের বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হতো। ফলে আইন ক'রে ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হলো। তারপর এদেশের শাসন-ক্ষমতা হাতে পাবার পর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ইংরেজরা কঠিন অত্যাচার চালিয়ে বাংলার এই বয়ন-শিল্প নষ্ট ক'রে দিল। শোনা যায় তারা বাঙালী তাঁতীদের হাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে দিত। তখন তারা আর মসলিন

আলিবর্দি খাঁর কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। তাই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র **সিরাজউদ্দৌলা** বাংলার নবাবী লাভ করলেন। তখন সিরাজ তরুণ যুবক মাত্র।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তখন বাংলাদেশে ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি জাতি কুঠি স্থাপন ক'রে বসেছে। কিন্তু ইংরেজদের প্রতিপত্তিই বেশী। ইংরেজদের ব্যবহারে সিরাজ আগে থেকেই তাঁদের উপর মনে মনে বিরক্ত ছিলেন। সিরাজকে তরুণ বয়সী দেখে ইংরাজেরা প্রথম থেকেই তাঁর আদেশ অমান্য করতে আরম্ভ করল। বাংলার নবাবের সঙ্গে ইংরাজদের একটি বাণিজ্য-চুক্তি ছিল। ইংরজেরা সেই চুক্তির সর্ত লঙ্ঘন করল। বিদেশী বণিকদের এই স্পর্ধা সিরাজ সহ্য করতে পারলেন না। ফলে শীঘ্রই ইংরাজদের সঙ্গে নবাবের বিরোধ বেধে উঠল। সিরাজ ইংরাজদের আক্রমণ ক'রে তাদের কলিকাতা দুর্গ দখল ক'রে নিলেন। কলিকাতার গভর্ণর ড্রেক সিরাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। তখন মাদ্রাজ থেকে ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ বাংলায় এসে নবাবের ফৌজের কাছ থেকে কলিকাতা পুনরুদ্ধার করলেন। সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি স্থাপিত হলো।

নবাবী দরবারের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সিরাজের বিরুদ্ধে। তাঁদের মধ্যে সেনাপতি মীরজাফর, ধনকুবের জগৎশেঠ, মহারাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রাজ্যশাসন ব্যাপারে সিরাজ তেমন পটু ছিলেন না। তাঁর ব্যবহারে রাজ্যের এই প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করেন। তা'

ছাড়া সিরাজের অত্যাচারে প্রজাসাধারণও তাঁর উপর প্রসন্ন ছিল না। এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করল বিদেশী শত্রু ইংরেজ বণিকেরা।

এই সময় য়ুরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে ওঠে। তার ফলে দক্ষিণ ভারতেও ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা হলো। ক্লাইভ বাংলা দেশের ফরাসী কুঠি চন্দননগর দখল করবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। ক্লাইভ আরও বুঝতে পারলেন যে সিরাজ যতদিন বাংলার নবাব থাকবেন, ততদিন তাঁদের নানা অসুবিধা ভোগ করতে হবে। তাই তিনি মীরজাফর, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ প্রভৃতি ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং নানাপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের আস্থাভাজন হলেন। পরস্পরের মধ্যে স্থির হলো যে যদি সিরাজউদ্দৌলাকে সরিয়ে মীরজাফরকে নবাবী দেওয়া হয়, তা'হলে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে' প্রচুর অর্থ দান করা হবে এবং **ক্লাইভ, ওয়াট্‌সন** প্রভৃতি ইংরেজ প্রতিনিধিগণ উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত হবেন।

ইতিমধ্যে ইংরেজগণ সিরাজের অনুমতি না নিয়েই বাংলার ফরাসী অধিকার চন্দননগর আক্রমণ ক'রে বসল। কয়েকজন ফরাসী নবাবের কাছে এসে আশ্রয় নিল। ফলে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ল।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত **পলাশী** নামক স্থানে আম্রকুঞ্জে ইংরেজ সৈন্য শিবির রচনা করল। উভয় পক্ষে যুদ্ধ বেধে উঠল। নবাবের পক্ষে রইল পঞ্চাশ হাজার সৈন্য আর ইংরেজদের পক্ষে মাত্র তিন হাজার ইংরেজ সৈন্য ও বাইশ শ' দেশীয় সৈন্য। এই অল্পসংখ্যক

সৈন্য নিয়েই ক্লাইভ নবাব-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন। যুদ্ধের সময় নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। বিপুল সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হয়েও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মীরজাফরের হাবভাব বুঝতে পেরে সেনাপতি **মীরমদন** ও **মোহনলাল** অমিত বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। ক্লাইভের সেনাবাহিনী প্রায় ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম হলো। ইংরেজদের পরাজয় সুনিশ্চিত দেখে সহসা মীরজাফর যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দিলেন। এই সুযোগে ক্লাইভ অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা নবাব-বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিলেন। প্রায় বিনা যুদ্ধেই ইংরেজগণ জয়লাভ করল। পলাশীর প্রাঙ্গণে বাংলার স্বাধীনতার অবসান হলো ; ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হলো।



লর্ড ক্লাইভ

পরাজিত সিরাজ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেলেন কিন্তু রক্ষা পেলেন না। মীরজাফরের অনুচরবৃন্দ তাঁকে ধরে নিয়ে এল। তারপর মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশ সিরাজউদ্দৌলাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। সিরাজের ক্ষতবিক্ষত দেহ হাতীর

পিঠে চড়িয়ে সারা মুর্শিদাবাদ শহর প্রদক্ষিণ ক'রে পরে আলিবর্দি খাঁর সমাধির পাশে কবর দেওয়া হলো। সে কবর এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর নবাব হলেন। কিন্তু নবাব হয়ে তিনি সুখে-শান্তিতে রাজত্ব করতে পারলেন না। নবাবী লাভের পুরস্কার স্বরূপ তিনি কোম্পানীকে প্রায় দুই কোটি টাকা দেবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সময়মত সে টাকা দিতে না পারায় কোম্পানী অত্যন্ত চাপ দিতে লাগলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও মীরজাফর সম্পূর্ণ টাকা শোধ দিতে পারলেন না। তখন কোম্পানীর পক্ষ থেকে মীরজাফরকে পদচ্যুত ক'রে তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে নবাবী দান করা হলো।



মীরকাশিম

মীরকাশিম মীরজাফরের মত ইংরেজদের তাঁবেদার ছিলেন না। তা' ছাড়া শাসনকার্যেও তিনি ছিলেন সুনিপুণ। তাই ইংরেজদের উদ্ধত আচরণ ক্রমশঃ তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে লাগল। তিনি মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। সেখানে গিয়ে সৈন্যবিভাগের উন্নতি ক'রে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

এদেশে বাণিজ্য করতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কোন প্রকার শুল্ক দিতে হতো না। এই সুযোগ গ্রহণ ক'রে কোম্পানীর

'প্রতিটি কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে লাগল। ফলে ভারতীয় ব্যবসায়িগণকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হলো। নবাব মীরকাশিম এর প্রতিবাদ জানালেন কিন্তু কোন ফল হলো না। তখন নবাব শুল্ক-প্রথা একেবারে তুলে দিলেন। এতে ইংরেজ বণিক ও ভারতীয় বণিক সমান সর্তে বাণিজ্য করবার সুযোগ পেলেন। এই রকম ব্যবস্থা ইংরেজ বণিকদের মনঃপুত হলো না। তাঁরা ভয়ানকভাবে ক্ষুব্ধ হলেন। পাটনায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠির প্রধান পরিচালক এলিস সাহেব সহসা পাটনা শহর অধিকার ক'রে নিলেন। ইংরেজদের এই স্পর্ধা নবাব সহ্য করতে পারলেন না। তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

পর পর দুইবার ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হলো। মীরকাশিম দু'টি যুদ্ধেই পরাজিত হলেন। তিনি পালিয়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সুজাউদ্দৌলা নবাব মীরকাশিমকে সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাংলা অভিমুখে রওনা হলেন। পথে বক্সারে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হলো। কিন্তু এবারও নবাব-সৈন্য ইংরেজদের সঙ্গে পেরে উঠল না। মীরকাশিম পলায়ন করলেন। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের যে অধিকারের সূত্রপাত হয়েছিল, বক্সারের যুদ্ধে তা' সুদৃঢ় হলো। ক্লাইভ আবার মীরজাফরকে সিংহাসনে বসালেন।

এর অল্পদিন পরেই মীরজাফরের মৃত্যু হলো। ক্লাইভ তখন দেশে গিয়েছিলেন। তিনি লাটসাহেব হয়ে ফিরে এসে দিল্লীর বাদশাহ্ শাহ্ আলমের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার

দেওয়ানীর সনদ নিয়ে নিলেন। তখন মীরজাফরের এক পুত্র ছিলেন নবাব। ধীরে ধীরে সমস্ত ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে এসে গেল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ক'রে দু'বছর পরে ক্লাইভ আবার দেশে ফিরে গেলন। তাঁর জায়গায় ভেলরেস্ট ও তারপর কার্টিয়ার লাটসাহেব হয়ে এলেন।

মনে রেখো

১৭০০-১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে—মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকাল
১৭৪০-৫৬ " —আলিবর্দি খাঁর শাসনকাল
১৭৫৬-৫৭ " —সিরাজউদ্দৌলার শাসনকাল
১৭৫৭ (২৩ শে জুন)—পলাশীর যুদ্ধ
১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে —বক্সারের যুদ্ধ

অনুশীলনী

১। মুর্শিদাবাদের নবাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
২। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে ? তাঁর সম্বন্ধে যা' জান বল।
৩। পলাশীর যুদ্ধের বর্ণনা দাও। কিরূপে সিরাজের পতন ঘটল ?
৪। মীরকাশিম সম্বন্ধে কী জান ?
৫। মীরজাফরের সঙ্গে মীরকাশিমের তুলনা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও ওয়ারেন হেস্টিংস্

কার্টিয়ার যখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার লাটসাহেব, তখন বাংলা দেশে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষ বাংলা ১১৭৬ সালে হয়েছিল বলে একে **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর** বলা হয়ে থাকে।

ভেলরেস্ট ও কার্টিয়ারের লাটসাহেবির আমলে এদেশে শাসনকার্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। একদিকে কোম্পানীর ও অন্যদিকে নবাবের কর্মচারিদের অত্যাচার ও শোষণে দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা দুঃসহ হয়ে ওঠে। ইংরেজরা কেবল রাজস্ব বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করতেন। ঠিকমত তা' আদায় না হলে প্রজাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করতেন। এই অবস্থায় চাষীরা এমন নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল যে চাষবাসের সাজ-সরঞ্জাম কিনবার মত অবস্থা পর্যন্ত তাদের ছিল না। তারপর পর পর দু'বছর অনাবৃষ্টির দরুণ দেশে অজন্মা হলো। অল্প-সল্প ফসল যা' উৎপন্ন হলো তার অধিকাংশ কোম্পানীর সিপাহীদের জন্য গোলাজাত করা হলো। ফলে অনিবার্যভাবে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিল। দৈনিক হাজার হাজার লোক মরতে লাগল। অন্নাভাবে লোকে গাছের পাতা খেতে লাগল; শেষে তা'ও অমিল হয়ে উঠল। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে বাংলা দেশের বহু নগর ও গ্রাম উচ্ছন্ন হয়ে গেল। বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক এই মন্বন্তরে প্রাণ হারিয়েছিল। এই

মন্বন্তরের কুফল-মুক্ত হতে বাঙালীর প্রায় চল্লিশ বছর লেগেছিল। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠ-এ এই ভয়াবহ মন্বন্তরের চমৎকার চিত্র অঙ্কিত ক'রে রেখে গেছেন। বাংলার এই চরম দুর্দিনেও কোম্পানীর কর্মচারিগণ লোকের দুঃখমোচনের কোন চেষ্টা করেনি। বরং দুর্ভিক্ষের পরবছরও তারা জোর-জুলুম ক'রে নির্দিষ্ট রাজস্বের অনেক বেশী আদায় করেছিল।

ওয়ারেন হেস্টিংস্—কার্টিয়ারের পর লাটসাহেব হন ওয়ারেন হেস্টিংস্। মাত্র আঠার বছর বয়সে কোম্পানীর অধীনে এক সামান্য কেরানির কাজ নিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস্ কলিকাতায় আসেন। তারপর নিজের প্রতিভা ও যোগ্যতার বলে ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠির ম্যানেজার ও শেষ পর্যন্ত লাটসাহেব হন।


ওয়ারেন হেস্টিংস্

ক্লাইভের আমল থেকে এযাবৎ দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ দেশ-শাসনের ব্যাপারে কোম্পানীর কিছু ক্ষমতা ছিল, নবাবেরও কিছু ক্ষমতা ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস্ এই ব্যবস্থা উঠিয়ে দিলেন। নবাবের ক্ষমতা একেবারে লোপ পেল; তিনি ইংরেজের বৃত্তিভোগী হলেন মাত্র। দেশ-শাসনের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে

কোম্পানীর হাতে এসে গেল। মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে কলিকাতায় প্রধান শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হলো। প্রতি জেলায় রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন ক'রে কালেক্টর নিযুক্ত হলো। দেশের লোক যাতে সুবিচার পায় সেজন্য প্রতি জেলায় একটি **দেওয়ানী** ও একটি **ফৌজদারী** আদালত এবং কলিকাতায় একটি সদর দেওয়ানী ও একটি সদর নিজামত নামে দু'টি সর্বোচ্চ আদালত গড়ে উঠল। এইভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলের প্রকৃত শাসনকর্তা হয়ে উঠল।

এতদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। ক্রমশঃ তাঁরা বুঝতে পারলেন যে কোম্পানীর চেষ্টায় ভারতে একটি সাম্রাজ্যের পত্তন হচ্ছে; তখন তাঁরা এক নূতন আইনের বলে ওয়ারেন হেস্টিংস্‌কে বড়লাট বা গর্ভর্নর-জেনারেল পদবীতে ভূষিত করলেন। তাঁকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবার জন্য চারজন সদস্য নিয়ে একটি মন্ত্রণা-পরিষদ এবং কলিকাতায় 'সুপ্রীম কোর্ট' নামে একটি প্রধান বিচারালয় স্থাপিত হলো; প্রধান বিচারপতি হলেন হেস্টিংসের বাল্যবন্ধু স্যার এলিজা ইম্পে।

ভারতে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম করবার জন্য তখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য হেস্টিংস্ রাজস্ব ও কর আদায়ের নিমিত্ত প্রজার উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন করতেন। তিনি বারাণসীর রাজা চৈৎ সিং ও অযোধ্যার নবাবের বেগমদের নিকট থেকে ছলে-বলে কৌশলে প্রচুর অর্থ আদায় করেছিলেন। এইজন্য অনেকেই তাঁর ব্যবহারে খুশি ছিলেন না।

কিছুদিন পরে মন্ত্রণা-পরিষদের কয়েকজন সদস্যও হেস্টিংসের বিরোধিতা আরম্ভ করলেন। মহারাজ নন্দকুমার নামে একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ হেস্টিংসের বিরুদ্ধে ঘুষ খাওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করলেন। এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট প্রমাণ ও দলিলপত্রও দাখিল করেন। এই অবস্থায় হেস্টিংস্ মহা বিপদে প'ড়ে গেলেন। তিনি সুপ্রীম কোর্টে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। বিচারে হেস্টিংসের পরাজয় হলো। তিনি গত্যন্তর না দেখে মোহনপ্রসাদ নামে এক ব্যাক্তর দ্বারা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে মিথ্যা জালিয়াতির অভিযোগ আনালেন। বিচারক ও জুরীদের অনেকেই ছিলেন হেস্টিংসের বন্ধু ও অনুগত লোক। তখন বিলাতের আইনে জালিয়াতির শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। বিচারে নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হলেন। তাঁর ফাঁসি হলো।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর মারাঠা-শক্তি ভারতবর্ষে সর্বপ্রধান হয়ে ওঠে। সেইজন্য ইংরেজরা এতদিন মারাঠাদের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রেখে চলছিল। তখন মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রধান নায়ক ছিলেন পেশোয়া। পুনায় ছিল পেশোয়ার রাজধানী। বোম্বাইয়ের ইংরেজরা অতিরিক্ত অর্থলোভের দরুণ মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত হলো। অথচ বিশাল মারাঠা শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠবার মত শক্তি ইংরেজদের হয়নি। ফলে হেস্টিংস্‌কে বাংলাদেশ থেকে অর্থ ও সৈন্য পাঠিয়ে বোম্বাইয়ের ইংরেজদের সাহায্য করতে হলো। ইতিমধ্যে মহীশূরের শাসন-কর্তা হায়দর আলী মাদ্রাজ আক্রমণ করলেন। ফলে হেস্টিংস্‌কে মাদ্রাজ রক্ষার জন্য হায়দর আলীর সঙ্গেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হলো।

কিছুকাল পরে হেস্টিংস্ পদত্যাগ করে বহু টাকাকড়ি নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। কিন্তু দেশে গিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন না। সেখানে কয়েকজন সচ্চরিত্র ইংরেজ ভারতীয়দের প্রতি অত্যাচার, উৎপীড়ন ও তাদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ উত্থাপন করলেন। সাত বছর ধরে বিচার চলল। বহু টাকা ব্যয়ে ও বহু কষ্টে শেষ পর্যন্ত অবশ্য হেস্টিংস্ মুক্তিলাভ করলেন।

মনে রেখো

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে—(বাংলা ১১৭৬)—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর
১৭৭২-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ—ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকাল
১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে—ওয়ারেন হেস্টিংসের বাংলার লাটসাহেবি লাভ
১৭৭৫ „ —নন্দকুমারের ফাঁসি

অনুশীলনী

১। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কাকে বলে? এই মন্বন্তরের কারণ কী?
২। হেস্টিংসের প্রথম জীবন সম্বন্ধে কী জান?
৩। নন্দকুমারের ফাঁসির কারণ কী?
৪। হেস্টিংসের শেষজীবন সম্বন্ধে যা' জান বল।

হায়দর আলী ও টিপু সুলতান—তাঁদের স্বাধীনতাসংগ্রাম

মোগল সাম্রাজ্যের শেষদিকে দক্ষিণ ভারতে মহীশূর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে হায়দর আলী নামে একজন দুঃসাহসী ও বুদ্ধিমান মুসলমান ঐ রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করেন। যেমন হায়দর আলী, তেমন তাঁর পুত্র টিপু সুলতান। উভয়েই মহীশূর রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং ইংরেজদের কবল থেকে মহীশূরকে রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ লড়াই করেছিলেন।

হায়দর আলী—প্রথম জীবনে হায়দর আলী একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন। পরে নিজের বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে মহীশূর রাজ্যের শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করেন। চারিদিকে হায়দরের শত্রুর অভাব ছিল না। হায়দরাবাদের নিজাম ও আর্কটের নবাব সুযোগ জেনেই তাঁর অনিষ্ট করতে চেষ্টা করতেন। মারাঠাদের সঙ্গেও তাঁর শত্রুতার সৃষ্টি হলো।


হায়দর আলি

এই সময়ে হায়দর আলীর সঙ্গে মাদ্রাজের ইংরেজদের মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। এই মনোমালিন্যের ফলে শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে হায়দরকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হলো।

হায়দর বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ইংরেজদের ছত্রভঙ্গ ক'রে দিলেন। বিপন্ন ইংরেজ হায়দরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করল। সন্ধির প্রধান সর্ত হলো এই যে, মারাঠারা ভবিষ্যতে মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করলে ইংরেজরা হায়দরকে সাহায্য করবে। কিন্তু মারাঠারা যখন সত্যি সত্যি মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করল তখন ইংরেজরা সন্ধির সে সর্ত পালন করল না। ইংরেজদের এই বিশ্বাসঘাতকতা হায়দর ভুলতে পারলেন না।

ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রাম—দশ বছর পরে য়ুরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে উঠল। তখন ভারতীয় ইংরেজরা হায়দরের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে ফরাসীদের কুঠি আক্রমণ করল। হায়দর আলী চরমভাবে ক্ষুব্ধ হলেন ইংরেজদের ব্যবহারে। মারাঠারাও তখন ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে রত। এই সুযোগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে বসলেন। বৃদ্ধ হায়দর অমিত বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে ইংরেজদের সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ করলেন। এই সংবাদ জানতে পেরে হেস্টিংস্ বাংলাদেশ থেকে সৈন্য পাঠালেন বিপন্ন ইংরেজদের সাহায্য করবার জন্য। দুর্ভাগ্যক্রমে হায়দর এবার পেরে উঠলেন না। এর অল্পদিন পরেই হায়দরের মৃত্যু হয়।

টিপু সুলতান—হায়দর আলীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। টিপু তাঁর পিতা হায়দরের মতই সাহসী, তেজস্বী ও রণকুশল ছিলেন। সেইজন্য তাঁকে 'মহীশূরের শার্দূল' বলা হতো।

ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রাম—ইংরেজদের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধে টিপু সুলতান জয়লাভ করলেন। তখন ইংরেজরা বাঙ্গালোরে সন্ধি স্থাপন ক'রে যুদ্ধ শেষ করল। সন্ধির সর্ত অনুসারে উভয় পক্ষ পরস্পরের বিজিত রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। ইতিহাসে একেই **দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ** বলা হয়ে থাকে।


টিপু সুলতান

এই সন্ধির পাঁচ বছরের মধ্যে টিপু ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করলেন। ত্রিবাঙ্কুর ছিল তখন ইংরেজদের আশ্রিত রাজ্য। এইজন্য ইংরেজরা টিপুর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল। এই যুদ্ধে ইংরেজদের অধিনায়ক ছিলেন **লর্ড কর্ণওয়ালিস**। হায়দরাবাদের নিজাম ও মারাঠারা ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিলেন। নির্ভীক টিপু একাকী শেষ তিনটি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত তিনি এঁটে উঠতে পারলেন না। ইংরেজ-সৈন্য টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের সম্মুখে উপস্থিত হলে টিপু বাধ্য হয়ে সন্ধি করলেন। এর জন্য টিপুকে প্রায় অর্ধেক রাজ্য ছেড়ে দিতে হোল ও নগদ তিন কোটি টাকারও বেশী ইংরেজকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে স্বীকৃত হতে হলো। এই নগদ টাকার জামিন বাবদ টিপু তাঁর দুই পুত্রকে ইংরেজদের শিবিরে পাঠাতে বাধ্য হলেন। একেই **মহীশূরের তৃতীয় যুদ্ধ** বলা হয়।

এইভাবে পরাজয়ের ফলে ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েও টিপুর মনোবল কমল না। ফরাসীদের সঙ্গে টিপুর সদ্ভাব ছিল। স্থায়িভাবে ইংরেজদের অধীনতা মেনে নেবার আগে শেষ চেষ্টা করবার উদ্দেশ্যে তিনি ফরাসীদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের পর স্যার জন শোর, তারপর লর্ড ওয়েলেস্‌লি বড়লাট হয়ে আসেন। ওয়েলেস্‌লির ইচ্ছা ছিল ভারতবর্ষ থেকে ফরাসী প্রভাবের মূলোচ্ছেদ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার করা। তিনি যেই বুঝতে পারলেন যে ফরাসীদের সঙ্গে টিপুর সদ্ভাব আছে, তখন থেকেই টিপুকে জব্দ করবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। বড়লাট হয়েই ওয়েলেস্‌লি দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে নূতন এক নীতিতে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করতে চাইলেন। এই নীতি অনুসারে ঠিক হলো যে, যে সমস্ত দেশীয় রাজা নিজ নিজ রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য রেখে তার ব্যয়ভার বহন করতে সম্মত হবেন, সে সমস্ত রাজ্য-গুলিকে ইংরেজরা অন্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন। এই রকমের প্রস্তাব এক কথায় ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব।

টিপু সুলতান ইংরেজদের এই 'অধীনতামূলক মিত্রতা'র প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত না হওয়ায় লর্ড ওয়েলেস্‌লি মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করলেন। ইংরেজ-সৈন্য টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে প্রবেশ করল। টিপু সুলতান স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। মহীশূর রাজ্য ইংরেজরা অধিকার ক'রে তিন ভাগে বিভক্ত করল। কিছু অংশ কোম্পানীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো, কিছু অংশ ইংরেজদের বন্ধু নিজামকে দেওয়া

হলো আর অবশিষ্ট অংশ মহীশূরের প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের এক ব্যক্তির অধীনে রাখা হলো। এইভাবে স্বাধীন মহীশূর রাজ্যের পতন হলো। তবু টিপু সুলতান স্বাধীনতার যোদ্ধারূপে ভারতবর্ষের ইতিহাসে আপন কীর্তিতে সমুজ্জ্বল।

মনে রেখো

১৭৬১-৮২ খ্রীষ্টাব্দ—হায়দর আলীর রাজত্বকাল
১৭৬৭-৬৯ „ —ইংরেজদের সঙ্গে হায়দর আলীর প্রথম যুদ্ধ
১৭৮২-৯৯ „ —টিপু সুলতানের রাজত্বকাল
১৭৯০-৯২ „ —ইংরেজদের সঙ্গে টিপুর যুদ্ধ
১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে—ইংরেজদের সঙ্গে টিপুর শেষ যুদ্ধ

অনুশীলনী

১। মহীশূরের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সংক্ষেপে বল।
২। টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের কাহিনী সংক্ষেপে বল।
৩। লর্ড ওয়েলেস্লির মহীশূর রাজ্য আক্রমণের কারণ কী?

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ

বাবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে, তখন পাঞ্জাবে গুরু নানক শিখ ধর্মের প্রবর্তন করেন। 'শিখ' শব্দটির অর্থ হলো 'শিষ্য'। গুরু নানকের ধর্মমতে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের শিখ বলা হয়।

শিখ-জাতি—শিখেরা চিরদিনই বীরের জাতি। স্পষ্ট-বাদিতার জন্য, বিশেষতঃ মোগল বাদশাহদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার অপরাধে কয়েকজন শিখ গুরুকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়েছিল। গুরু অর্জ্জুন সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে নিহত হয়েছিলেন, ঔরংজীব তেগ বাহাদুরকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। তেগবাহাদুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ-জাতিকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে নূতনভাবে গড়ে তোলেন। তাঁর আদর্শ ও শিক্ষার বলে শিখেরা দীর্ঘকাল যাবৎ মোগল ও আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বছর পরে শিখেরা পাঞ্জাবে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল। প্রবল পরাক্রান্ত আহমদ শাহ্ আবদালী কর্তৃক পাঞ্জাব বারংবার আক্রান্ত হলেও বীরের জাতি শিখেরা কখনও পরাজয় মানেনি।



রণজিৎ সিংহ

শেষে শিখদের ঐক্যবদ্ধ করে এক প্রবল শক্তিতে পরিণত করেন রণজিৎ সিংহ।

ইংরেজরা যখন ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রাজ্যগুলি অধিকার ক'রে নিল তখনও শিখেরা ইংরেজদের অধীনতা বরণ করেনি। এই সময় শিখ জাতি ভিন্ন ভিন্ন 'মিসিলে' বা দলে বিভক্ত ছিল।

প্রথম জীবন—রণজিতের পিতা **মহাসিংহ** ছিলেন এইরূপ একটি মিসিলের সর্দার। মহাসিংহের মৃত্যুর পর মাত্র বার বছর বয়সে রণজিৎ ঐ পদ লাভ করেন। রণজিৎ শিশু বয়সে একবার বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্যে তিনি লেখাপড়া বিশেষ শিখতে পারেননি ; কিন্তু বুদ্ধি, সাহস ও কৌশলে কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। এই অল্প বয়সেই তিনি এমন বুদ্ধি ও নির্ভীকতার পরিচয় দেন যে আফগান রাজা জামান শাহ্ এই শিখ বালককে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিছুকাল পরে রণজিৎ আফগান-প্রভুত্ব-স্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করে নিজের নামে মুদ্রা প্রচলিত করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বছর। তারপর রণজিৎ সিংহ ধীরে ধীরে বিভিন্ন শিখ মিসিলের অধীন খণ্ডরাজ্যগুলি অধিকার ক'রে এক শক্তিশালী শিখবাহিনী গড়ে তুললেন। এইভাবে শিখ-তীর্থ **অমৃতসর** তাঁর অধিকারে এসে গেল।

ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি—এবার রণজিৎ সিংহের দৃষ্টি পড়ল **শতদ্রু** নদীর ওপারে। তিনি সেখানের শিখরাজ্য

লুধিয়ানা অধিকার করলেন। এতে অন্যান্য শিখ সর্দারেরা ভীত হয়ে পড়ল। শতদ্রু নদীর দক্ষিণ দিকের কয়েকটি রাজ্য রণজিৎ সিংহের ভয়ে ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তখন বড়লাট ছিলেন লর্ড মিণ্টো। তিনি রণজিতের দরবারে দূত প্রেরণ করলেন। বুদ্ধিমান রণজিৎ ইংরেজদের শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। তিনি তাই ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ না বাড়িয়ে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলেন। এই সন্ধির নাম **অমৃতসরের সন্ধি**। এই সন্ধির সর্তানুসারে স্থির হলো যে রণজিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর দক্ষিণ-তীরের শিখ রাজ্য অধিকার করবেন না এবং ইংরেজরাও তাঁর রাজ্য আক্রমণ করবে না। রণজিৎ সিংহ এই সন্ধির সর্ত জীবনে কোনদিন ভঙ্গ করেন নি।

এরপর রণজিৎ সিংহ উত্তর ও পশ্চিমে রাজ্য বিস্তার করতে অগ্রসর হলেন এবং আফগানদের পরাজিত করে পেশোয়া জয় করলেন। এইভাবে রণজিৎ সিংহের রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হলো।

শোনা যায় রণজিৎ সিংহ একবার ভারতবর্ষের মানচিত্রে কয়েকস্থানে লাল রঙ দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তারপর যখন শুনতে পেলেন যে লাল রঙ ইংরেজ-অধিকৃত স্থানের নির্দেশ বহন করছে, তখন তিনি নাকি বলেছিলেন যে 'সব লাল হো যায়গা' অর্থাৎ একদিন সারা ভারতবর্ষ ইংরেজদের অধিকারে চলে যাবে।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ ইংরেজদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করতে পারেন নি। তাই তাঁর মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যেই ইংরেজরা শিখ-রাজ্য অধিকার ক'রে নেয়।

মনে রেখো

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে—রণজিৎ সিংহের জন্ম
১৮০৯ „ —রণজিৎ সিংহের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি
১৮৩৯ „ —রণজিৎ সিংহের মৃত্যু
১৮৪৯ „ —ইংরেজ কর্তৃক শিখরাজ্য অধিকার

অনুশীলনী

১। শিখ জাতি সম্বন্ধে কী জান সংক্ষেপে বল
২। 'শিখ' শব্দের অর্থ কী ?
৩। অমৃতসরের সন্ধি সম্বন্ধে কী জান ?
৪। শিখ-জাতির ইতিহাসে রণজিৎ সিংহের নাম স্মরণীয় কেন ?

পঞ্চদশ অধ্যায়

সিপাহী-বিদ্রোহ—ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম—মহারানীর ঘোষণা

ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজ্যবিস্তারে ও রাজ্যরক্ষায় সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিল দেশীয় সৈনিকেরা। এই দেশীয় সৈনিকদের বলা হতো **সিপাহী**। সিপাহীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান,—উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। পলাশীর যুদ্ধের একশ' বছর পরে দেশীয় সৈনিকেরা একবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ইতিহাসে এই ঘটনাকে **সিপাহী-বিদ্রোহ** বলা হয়। এই সিপাহী-বিদ্রোহই প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

বিদ্রোহের কারণ—সিপাহী বিদ্রোহের পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। তখন **লর্ড ডালহৌসী** ভারতের বড়লাট। ছলে বলে কৌশলে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের প্রসার করাই ছিল লর্ড ডালহৌসীর লক্ষ্য। তিনি নানা অজুহাতে একটির পর একটি করে দেশীয় রাজ্য অধিকার ক'রে নিতে লাগলেন। ফলে দেশীয় রাজগণ ইংরেজ-শাসনের উপর বিরূপ হয়ে উঠলেন। শেষ পেশোয়া ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজ্য হারান। তাঁকে ভরণপোষণের জন্য একটি বৃত্তি দেওয়া হতে থাকে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পোষ্যপুত্র নানাসাহেবকে এই বৃত্তি দেওয়া বন্ধ করা হয়। এইভাবে যে সমস্ত দেশীয় রাজ্য ইংরেজদের অধিকারে এল, সেখানকার কর্মচারী ও সৈন্য-সামন্তদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হলো। ফলে তারাও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ওদিকে

দিল্লীর বাদশাহ্ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে লর্ড ডালহৌসী সিংহাসনচ্যুত করবার চেষ্টা করলেন। এতে মুসলমান সিপাহীদের মনে দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হল।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ বেধে উঠল। তখন বাংলাদেশের সিপাহীদের ব্রহ্মদেশে যাবার আদেশ এল। কিন্তু সমুদ্র পারে গেলে ধর্মনাশ হবে, এই ভয়ে সিপাহীরা সে আদেশ মানতে অসম্মত হলো। তখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কড়া হুকুম জারী ক'রে জানিয়ে দিলেন যে সিপাহীদের ওসব আপত্তি গ্রাহ্য করা হবে না ; যুদ্ধের আয়োজনে তাদের যখন যেখানে যেতে বলা হবে, সেখানেই যেতে হবে। এই সমস্ত ঘটনা মিলিয়ে সিপাহীদের মনে ধারণা জন্মালো যে ইংরেজরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম নষ্ট ক'রে সবাইকেই খ্রীষ্টান করতে চায়। এতে কোম্পানীর প্রতি সিপাহীদের চরম বিদ্বেষের সঞ্চার হলো।

এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটল। ইংরেজরা সিপাহীদের প্রতি একপ্রকার নূতন বন্দুক ব্যবহারের আদেশ দিলেন। এই বন্দুকের টোটাগুলি ছিল শূকর ও গরুর চর্বি দিয়ে তৈরি এবং সেগুলিকে দাঁতে কেটে ভরতে হতো। এতে ইংরেজ কর্তৃক সিপাহীদের ধর্মনাশের চেষ্টা একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠল। এবার সিপাহীদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল এবং সর্বত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল।

বিদ্রোহের সূত্রপাত—সিপাহী-বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় কলিকাতার নিকটবর্তী ব্যারাকপুরে। **মঙ্গল পাণ্ডে** নামে জনৈক দেশীয় সিপাহী ক্ষেপে গিয়ে একজন য়ুরোপীয় সামরিক

কর্মচারীকে হত্যা করে বসল। এর পর শীঘ্রই মীরাট ও লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহ আরম্ভ হলো। ঐ সমস্ত স্থানের সিপাহীরা একত্রে বিদ্রোহী হয়ে য়ুরোপীয়গণকে হত্যা করল এবং তাদের ঘরবাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিল। তারপর তারা চলল দিল্লী অভিমুখে। সেখানে অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহী সিপাহীরা এসে যোগদান করল। মিলিত বিদ্রোহী সিপাহীদল দিল্লীর য়ুরোপীয়-গণকে হত্যা করে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কেই ভারতের সম্রাট্ বলে ঘোষণা করল। শীঘ্রই দাবানলের মত বিদ্রোহ ভারতের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ল এবং দিল্লী, মীরাট, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরেলী ও ঝান্সী বিদ্রোহের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে রূপান্তরিত হলো।

বিদ্রোহের প্রসার ও দমন—কানপুরের বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নানা সাহেব। তিনি নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করলেন। কানপুরে তখন সৈন্য ও সাধারণ অধিবাসী মিলে প্রায় এক হাজার ইংরেজ সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাস করছিল। নানা সাহেব তাদের ভরসা দিয়ে বললেন যে তিনি তাদের নিরাপদে এলাহাবাদে পৌঁছে দেবেন। ইংরেজরা এই ভরসার উপর আস্থা রেখে যেই নদীর দিকে এগিয়ে গেল, অমনি বিদ্রোহী সিপাহীরা বন্দুকের গুলিতে তাদের হত্যা করে ফেলল। নানা সাহেব এতেও খুশি হলেন না। তারপর প্রায় দু'শ ইংরেজ রমণী ও শিশুকে হত্যা করে একটি কূপে নিক্ষেপ করেন।

মধ্যভারতে বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন মারাঠা বীর **তাঁতিয়া টোপী** ও ঝান্সীর রানী **লক্ষ্মীবাঈ**। লক্ষ্মীবাঈ সবচেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে সৈন্য পরিচালনা করেন। এই বীরাঙ্গনার বীরত্ব সিপাহী-

TRAINING COLLE BASIC

বিদ্রোহের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবের বিষয়। পুরুষের বেশে তরবারি হাতে যুদ্ধ করতে করতে এই বীর রমণী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেন।

বিদ্রোহী সীপাহীরা সংখ্যায় কম ছিল না এবং বিদ্রোহ প্রায় সর্বত্রই আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু উপযুক্ত সেনাপতির অভাবে সে বিদ্রোহ অবশেষে ব্যর্থ হতে বাধ্য হলো। লর্ড ক্যানিং তখন ভারতের বড়লাট। তিনি অত্যন্ত কঠোরতা ও কৌশলে এই বিদ্রোহ দমন করলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁতিয়া টোপী পরাজিত হয়ে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন। নানা সাহেব নেপালের জঙ্গলে পলায়ন করলেন। বাহাদুর শাহ্ ইংরেজদের হাতে বন্দী হলেন এবং তাঁহাকে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত রেঙ্গুনে পাঠানো হলো। মোগল বাদশাহীর শেষ চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেল।

বিজয়ী ইংরেজরা এই ঘটনার নাম দিয়েছিল 'সিপাহী-বিদ্রোহ'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলা যেতে পারে। কারণ এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এক শ' বছরের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় বিক্ষোভ আন্দোলনের আকারে প্রকাশ লাভ করেছিল।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র—সিপাহী যুদ্ধের ফলে ভারতে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হলো। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ মনে করলেন যে বিশাল ভারতীয় সাম্রাজের শাসন-ভার আর কোম্পানীর হাতে রাখা সঙ্গত নয়। সুতরাং ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন। স্থির হলো যে একজন ভারত সচিবের সহায়তায় তিনি ভারত

শাসন করবেন। গভর্ণর জেনারেল হবেন ইংলণ্ডের রাজা বা রানীর প্রতিনিধি।

নূতন শাসন ভার হাতে নিয়ে মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতীয় প্রজাদের আশ্বস্ত করবার উদ্দেশ্যে এক ঘোষণাপত্রে প্রচার করলেন। এই ঘোষণাপত্র বলা হলো যে অন্যায়ভাবে কোন দেশীয় রাজ্য অধিকার করা হবে না, হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করা হবে না। যোগ্যতা অনুযায়ী জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়কে উচ্চ সরকারী কাজে নিযুক্ত করা হবে। মহারানী আরও বললেন যে বিদ্রোহী সিপাহীগণ অস্ত্রত্যাগ পূর্বক নিজের নিজের কাযে যোগদান করলে তাদের ক্ষমা করা হবে।



মহারানী ভিক্টোরিয়া

মনে রেখো

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে—পলাশীর যুদ্ধ
১৮৫৭ " —সিপাহী বিদ্রোহ
১৮৫৮ " —ইংলণ্ডের মহারানীর স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ ও ঘোষণাপত্র প্রচার।

অনুশীলনী

১। লর্ড ডালহৌসী কী ভাবে কোম্পানীর রাজ্যবিস্তার করেন?
২। সিপাহী বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয় কেন?
৩। মহারানীর ঘোষণাপত্রের সার মর্ম কী?

ষোড়শ অধ্যায়

জাতীয় কংগ্রেসের উত্থান—স্বাধীনতা সংগ্রাম—বঙ্গ বিভাগ—স্বদেশী আন্দোলন—গান্ধীজী, নেতাজী ও তাঁদের জীবনের বাণী

জাতীয় কংগ্রেসের উত্থান ও স্বাধীনতা সংগ্রাম—সিপাহী বিদ্রোহ আপাততঃ ব্যর্থ হলেও এই ঘটনা ভারতবাসীর মনে স্বদেশ-প্রেমের আগুণ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে ভারতবাসীর কিছু কিছু দাবী স্বীকৃত হলো বটে, কিন্তু ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পক্ষে তা' যথেষ্ট বলে বিবেচিত হলো না। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা ক্রমশঃ অনুভব করতে লাগলেন যে, স্বাধীনতা লাভ করতে না পারলে আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচা সম্ভব নয়। আর স্বাধীনতা লাভ করতে হলে সর্বাগ্রে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এই প্রয়োজন-বোধ থেকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব হয়। এ হলো সিপাহী বিদ্রোহের ২৮ বছর পরের ঘটনা।

সিপাহী বিদ্রোহের অনেকদিন আগে থেকেই এদেশে ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়। এই শিক্ষার সংস্পর্শে এসে ভারতবাসীর মনে নূতন ভাবধারা সঞ্চারিত হলো। দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি ও সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেন রাজা রামমোহন রায়। পরে পণ্ডিত ঈশ্বচন্দ্র

বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি নব যুগ প্রবর্তনের আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন।

সিপাহী বিদ্রোহের মাত্র এক বছর আগে কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর ফলে দেশে ইংরেজী শিক্ষার দ্রুত প্রসার হতে থাকে। ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে ইংরেজদের



উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

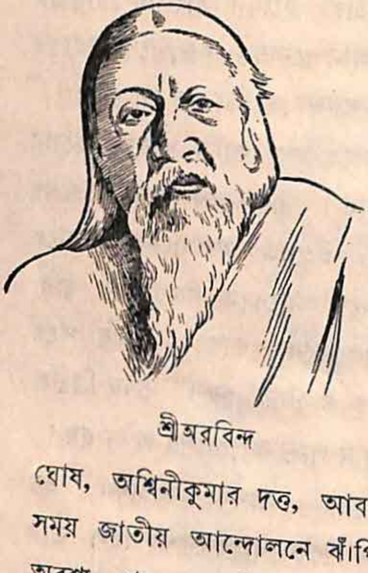
অধীনতা ছিন্ন করবার আগ্রহ প্রবল হতে থাকে। তখন অবশ্য পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আশা অনেকটা সুদূর পরাহত ছিল, তবে ধীরে ধীরে স্বায়ত্ব-শাসনের অধিকার লাভ করাই ছিল নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় বোম্বাই শহরে। প্রথম সভাপতি হন বাঙালী ব্যারিস্টার **উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**। তাছাড়া অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী—**মিঃ হিউম** ছিলেন কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। যে সমস্ত ভারতীয় নেতাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় কংগ্রেস গড়ে ওঠে, তাঁরা হচ্ছেন বাংলার রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু, বোম্বাইয়ের দাদাভাই নওরোজী, বদরুদ্দিনতায়েরজী ও ফিরোজ শা মেটা।

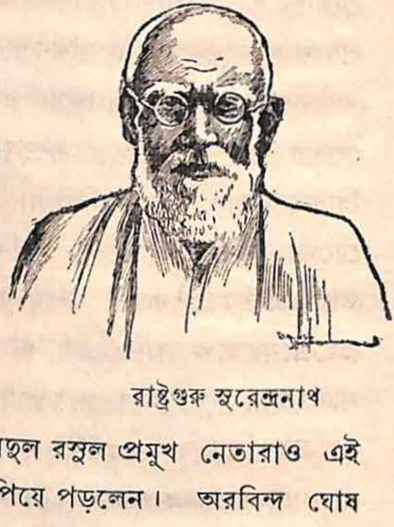
কংগ্রেসের প্রথম দিকে কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হলেন দেশের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়। এর সঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ কোন যোগ ছিল না। ইংরেজ সরকারের দরবারে দেশের অভাব অভিযোগ জানিয়ে আবেদন নিবেদনের দ্বারা তার প্রতিকার করাই ছিল কংগ্রেসের কাজ। এর পরে কংগ্রেসের লক্ষ্য আর এক ধাপ অগ্রসর হয়। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বায়ত্বশাসন লাভ কংগ্রেসের লক্ষ্য হয়।

বঙ্গ-বিভাগ—জাতীয়তাবোধের প্রথম উদ্বোধন হয় বাংলাদেশে। কংগ্রেসের প্রথম দিকে বাংলাদেশই ছিল তার প্রধান কেন্দ্র, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালীরাই ছিল সবার পুরোভাগে। বাংলার অভূতপূর্ব স্বদেশ-প্রেমের জাগরণ দেখে ইংরেজ সরকার মনে মনে ভয় পেয়ে গেল। তখন **লর্ড কার্জন** ছিলেন বড়লাট। তিনি বাঙালী জাতিকে দুর্বল করবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে দুইভাগে ভাগ করলেন। একভাগে থাকল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা; আর এক ভাগে গেল পূর্ববঙ্গ ও আসাম।

বাঙালী জাতি এই অন্যায় ব্যবস্থা কিছুতেই মেনে নিতে সম্মত হলো না। সারা বাংলা দেশ জুড়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হলো। এই আন্দোলনের প্রধান নেতা হলেন **রাষ্ট্রগুরু স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** ও বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল। অরবিন্দ



শ্রীঅরবিন্দ



রাষ্ট্রগুরু স্থরেন্দ্রনাথ

ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আবহুল রস্থল প্রমুখ নেতারাও এই সময় জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অরবিন্দ ঘোষ অবশ্য পরে রাজনীতি পরিত্যাগ করে ধর্ম-সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেন।

দেশের চিন্তাশীল সাহিত্যিকেরাও এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, কান্তকবি রজনীকান্ত সেন, নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ প্রভৃতির প্রবন্ধে, গানে, কবিতায়, নাটকে স্বদেশ প্রেমের আগুন জ্বলে উঠল। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেরও সমর্থন

লাভ করল। মহামতি গোখলে, লোকমান্য তিলক, পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বাংলার দাবী সমর্থন করলেন। আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইংরেজ সরকার অবশেষে বঙ্গ-বিভাগ রদ করতে বাধ্য হলেন। আবার তুই বাংলা এক হয়ে গেল। বাঙালীর হোলো জয়। কিন্তু এই সময় আসাম পৃথক হলো, বিহার ও উড়িষ্যা মিলে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হলো এবং কলিকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হলো।

স্বদেশী আন্দোলন—বঙ্গ-বিভাগ রদ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ইংরেজ বণিকেরা ভারতে মাল বিক্রয় ক'রে প্রচুর অর্থলাভ করত। তাদের এই স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় এই জন্য ইংরেজ সরকার নানা উপায়ে এদেশের শিল্পগুলি ধ্বংস করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হলো সেই সমস্ত শিল্পগুলিকে আবার বাঁচিয়ে তোলা। কারণ দেশের নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারলেন যে দেশীয় শিল্প বেঁচে উঠলেই ভারতে বিলাতী জিনিসের চাহিদা আপনা থেকেই কমে যাবে এবং তাতে ইংরেজ বণিকদের ক্ষতি অনিবার্য। বঙ্গভঙ্গ রদের সময়, ইংরেজদের প্রতি ভারতবাসীর মনে বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়; তার ফলে স্বদেশী আন্দোলন সহজেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। জাতি বিলাতী জিনিস বর্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করল।

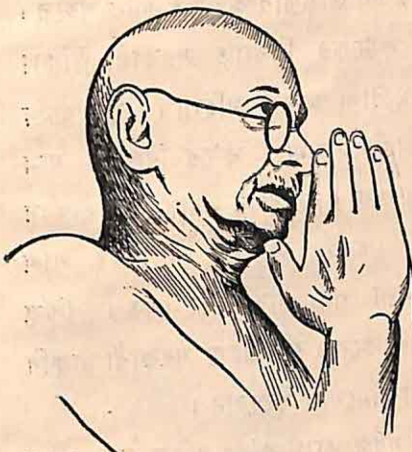
ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ বেধে উঠল। ইংরেজ জাতি এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হলো। বঙ্গ-বিভাগ রদ হলেও ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের অন্যান্য দাবি মেনে নিতে রাজী হয়নি।

তা' সত্ত্বেও যুদ্ধে জড়িত হয়ে ইংরেজ সরকারকে ভারতবাসীর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলো। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের চরম বিপদের সময়ে ভারতবর্ষ নানাপ্রকারে ইংরেজদের সাহায্য করল কিন্তু যুদ্ধের শেষে প্রতিদানে তারা বিশেষ কিছুই পেল না। নূতন নূতন আইন প্রবর্তিত হলো বটে কিন্তু তাতে ভারতবাসীরা বিশেষ কোন ক্ষমতালাভের অধিকারী হলো না। এতে ইংরেজদের শঠতার স্বরূপ ধরা পড়ল। তখন হিন্দু ও মুসলমান মিলিত হয়ে স্বরাজ লাভের জন্য নূতন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গান্ধীজী ও নেতাজী—এই নূতন সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন **মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী**। গান্ধীজীর জন্ম হয় পোরবন্দরে। তিনি জাতিতে ছিলেন গুজরাটি। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় পাশ করেন। তারপর কয়েক বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন-ব্যবসায় করেন। পরে আইন-ব্যবসায় পরিত্যাগ ক'রে তিনি সেখানকার প্রবাসী ভারতবাসীর অধিকার রক্ষার জন্যে **সত্যাগ্রহ আন্দোলন** পরিচালনা করেন। সে আন্দোলন অনেকাংশে সফল হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে গান্ধীজী ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন।

গান্ধীজীকে পেয়ে কংগ্রেস কর্মীদের মনে নূতন প্রেরণার সঞ্চার হলো। গান্ধীজীও ভারতবাসীকে নূতন মন্ত্রে শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেন, মানুষকে ভালোবাসা দিয়ে জয় করতে হবে, পরম শত্রুকেও কখনও হিংসা করা চলবে না। ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য শুধু শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্দোলন ক'রে যেতে

হবে। তাতে যদি অত্যাচারিত হতে হয় সেও ভালো ; হাসিমুখে নির্ভীক চিত্তে তা' সহ্য করতে হবে তবু পাল্টা অত্যাচার করা চলবে না। এতদিন লোকে জানত যে কেবলমাত্র রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়েই পরাধীন জাতির মুক্তি সম্ভব। কিন্তু গান্ধীজীর শিক্ষা থেকে লোকের সে-ভুল ভাঙল। তারা শিখল যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিনা রক্তপাতেও স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব নয়। গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমানকে এক হতে আহ্বান জানালেন, পরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে উপদেশ দিলেন এবং সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির মন্ত্র প্রচার করলেন। তিনি দেশের লোককে স্বাবলম্বী করবার উদ্দেশ্যে **চরকার** প্রচলন করলেন। তখন থেকে ভারতের জাতীয় পোশাক হলো **খদ্দর**।



মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের আন্দোলন অগ্রসর হতে থাকল। তারপর এলো মহাত্মাজীর বিখ্যাত **লবণ আইন আন্দোলন**। এই সময় গান্ধীজী প্রমুখ নেতাগণ কারারুদ্ধ হলেন। দেশের লোকের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হলো।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা গান্ধীজীর সহকর্মী ছিলেন,

তাঁদের মধ্যে **সুভাষচন্দ্র বসুর** নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইনি পরবর্তীকালে **নেতাজী** রূপে পরিচিত হন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয় উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক শহরে। তাঁর পিতা জানকীনাথ বসু কটকের বিখ্যাত সরকারী উকিল ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন ধর্মপ্রাণা আদর্শ মহিলা। সুভাষচন্দ্র কটক ও কলিকাতায় শিক্ষাজীবন সমাপ্ত ক'রে বিলাতে যান আই. সি. এস্. পরীক্ষা দিবার জন্য। তারপর যথারীতি পরীক্ষায় পাশ ক'রে ফিরে আসেন। আই. সি. এস্. পরীক্ষায় পাশ করলে তখন সর্বোচ্চ সরকারী পদ লাভ করা যেত। কিন্তু আই. সি. এস্. পরীক্ষায় পাশ করেও সুভাষচন্দ্র সরকারী চাকুরি গ্রহণ না ক'রে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে দরিদ্র দেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সুভাষচন্দ্র তাঁকে গুরু বলে মেনে নিয়ে তাঁর সহকর্মীরূপে কাজ আরম্ভ করলেন। প্রথম জীবনে গান্ধীজীর আদর্শও তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি নূতন পথ ও মতের পক্ষপাতী হন। সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারেন যে অস্ত্রবলে বলীয়ান ইংরেজ সরকার কখনই সদিচ্ছার বশে ভারতের স্বাধীনতা



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

ভারতবাসীর হাতে তুলে দিয়ে চলে যাবে না। তাকে সরাতে হলে ভারতবাসীকেও অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে তার সঙ্গে প্রকাশ্যে যুঝতে হবে। তাই তিনি গান্ধীজীর শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র সংগ্রামের পথ ছেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ অবলম্বন করলেন। এই সময় থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম দুইটি পরস্পর-বিরোধী পথে চলতে শুরু করে।



নেতাজী সুভাষচন্দ্র

সুভাষচন্দ্র দু'বার কংগ্রেসের সভাপতির পদ লাভ করেন। দ্বিতীয়বার সভাপতি পদে থাকাকালে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি সভাপতি পদে ইস্তফা দেন। তারপর অন্যান্য বিষয়ে আরও গুরুতর মতভেদ হলো। তখন তিনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে **ফরওয়ার্ড ব্লক** নামে এক সর্বভারতীয় বামপন্থী দল গড়ে তুললেন। যাঁরা কংগ্রেসে রয়ে গেলেন তাঁরা রইলেন আপসে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে স্বাধীনতার অধিকার আদায়ের পক্ষপাতী। আর যাঁরা আপস-বিরোধী তাঁরা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিলেন।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে উঠল। এই যুদ্ধেও ইংরেজ জাতি জড়িয়ে পড়ল। সুভাষচন্দ্র বুঝলেন যে এই সময় বিপন্ন ইংরেজের কাছ থেকে চাপ দিয়ে কিছু আদায় না করলে আর এমন সুযোগ আসবে না। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। শীঘ্রই সে সুযোগ এসে গেল। একদিন তিনি পুলিশের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে কলিকাতা থেকে পলায়ন করলেন। প্রথমে তিনি আফগানিস্তানের পথে রাশিয়ায় এবং পরে জার্মানীতে যান। সেখান থেকে মালয়, মালয় থেকে ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হন। তখন জাপানীরা মালয় ও ব্রহ্মদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেছে। সুভাষচন্দ্র সেখান থেকে ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করে এক নূতন মুক্তি ফৌজ গড়ে তুললেন। তার নাম হলো **আজাদ হিন্দ ফৌজ** বা ভারতীয় জাতীয় বাহিনী। ভারতবর্ষের মাটি থেকে ইংরেজ সরকারের উচ্ছেদ করবার উদ্দেশ্যে এই বাহিনী আসামের সীমান্ত পর্যন্ত এসেছিল। এই বাহিনীর সৈন্যেরা সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' রূপে মেনে নিয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রচেষ্টায় **আজাদ হিন্দ সরকার** নামে একটি জাতীয় সরকার পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল। এই স্বাধীন সরকারকে জার্মানী, ইটালী, জাপান প্রভৃতি নয়টি রাষ্ট্র স্বাধীন বলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে ভারতকে স্বাধীন করবার পূর্বেই এই সরকারের পতন হয়।

ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। সমস্ত আপসের চেষ্টা ব্যর্থ হলে মহাত্মাজী এই আন্দোলন করতে বাধ্য হন। **ভারত ছাড়ো** প্রস্তাব কংগ্রেস

কর্তৃক গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার গান্ধীজীপ্রমুখ বিশিষ্ট নেতাদের কারারুদ্ধ করলেন। প্রতিবাদে দেশবাসী ক্ষেপে গেল। দাউ দাউ করে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। এই আন্দোলন ইতিহাসে **আগষ্ট আন্দোলন** নামে বিখ্যাত।

আজাদ হিন্দ সরকারের পতন হলে আজাদ হিন্দ ফৌজের বহু সৈন্যকে ইংরেজ সরকার বন্দী করে ভারতবর্ষে নিয়ে আসে। তারপর দিল্লীতে তাদের বিচার শুরু হয়। এই বিচার-ব্যবস্থারও প্রতিবাদে সারা ভারতবর্ষ কঠিন কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ জানাল। ইংরেজরা মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল ভারতের এই জাতীয় জাগরণ দেখে। তারা ভাবল যে আর ভারতকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তারা এবার স্বাধীন হবেই। সুতরাং ভারতবাসীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হলে তাদের সঙ্গে যেভাবেই হোক আপস নিষ্পত্তি করা সমীচীন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার পরিবর্তন হলো। শ্রমিকদল ইংলণ্ডের শাসন-ক্ষমতা লাভ করল। এই নবগঠিত শ্রমিক সরকার ভারতের সমস্ত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম ক'রে ভারতবাসীর হাতে ভারতের শাসনভার তুলে দিতে আগ্রহী হলো। এই পরিকল্পনানুযায়ী **গণপরিষদ** গঠিত হলো। কিন্তু মহম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে 'মুসলিম লীগ' এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করল। মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানের জন্য পৃথক রাষ্ট্র দাবি ক'রে বসল। ফলে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বেধে উঠল। অবশেষে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের মধ্যস্থতায় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ

করল। কিন্তু মুসলিম লীগের জিদে ভারতবর্ষ খণ্ডিত হয়ে দু'টি নূতন রাষ্ট্র জন্ম লাভ করল—**ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান।** ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী হলেন গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্য **পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।**



পণ্ডিত জওহরলাল

গান্ধীজীর বাণী—গান্ধীজী বলেছেন—'আমার জীবনই আমার বাণী'। অর্থাৎ যে ধারণা ও বিশ্বাসকে তিনি কাজের মধ্য দিয়ে জীবনে প্রকাশ করতে পারেন নি, তা' কখনও মুখে প্রচার করেন নি। গান্ধীজীর পূর্ণ জীবনী পড়লে এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হবে। তিনি বলেছেন—'আমি সেই ভারতের জন্য কাজ ক'রে যাবো, যে ভারতে অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও মনে করতে পারবে—এ তার দেশ, এ দেশে তার একটি অস্তিত্ব আছে। সে ভারতে মানুষে মানুষে উঁচু-নীচু ভেদ থাকবে না, সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি বিরাজ করবে···নারী সে ভারতে ভোগ করবে পুরুষের সমান অধিকার।'

'সত্যিকার শিক্ষা শুধু বই পড়লেই হয় না, হয় চরিত্রের দ্বারা, হাতে পায়ের চেষ্টায় ও শরীরের মেহনতের দ্বারা।'

'যে জাতি বা যে ধর্ম অন্যায়, অসত্য ও হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত, একদিন না একদিন তার অস্তিত্ব পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য।'

'আমার জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে—**সত্য ও অহিংসা।'**

নেতাজীর বাণী—নেতাজী ছিলেন নির্ভীক আত্মত্যাগী পুরুষ। তিনি যা' বিশ্বাস করতেন তা' কখনও কাজে করতে ভয় পেতেন না। নিজের জীবনের দ্বারা তিনি তাঁর আদর্শকে জগতের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তিনি বলেছেন—

'অন্যায়ের সঙ্গে আপস করবার মত বড় পাপ আর নেই।'

'কষ্ট স্বীকার ও আত্মত্যাগ করতে না পারলে কখনও কোন মহান্ উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলা যায় না।'

মনে রেখো

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে—মহাত্মা গান্ধীর জন্ম
১৮৮৫ „ —ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উত্থান
১৮৯৭ „ —নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্ম
১৯০৫ „ —বঙ্গ-বিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা
১৯১১ „ —বঙ্গ-বিভাগ রদ
১৯১৪ „ —প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাত
১৯২০ „ —মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন
১৯৩৯ „ —দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত; সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচন
১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে—সুভাষচন্দ্রের ছদ্মবেশে ভারত ত্যাগ
১৯৪২ „ —আগস্ট আন্দোলন
১৯৪৩ „ —আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠা
১৯৪৭ „ —ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ

অনুশীলনী

১। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কারণ কী?

২। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?

৩। বঙ্গ বিভাগ সম্বন্ধে যা' জান সংক্ষেপে বল।

৪। স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?

৫। গান্ধীজী সম্বন্ধে কী জান বল?

৬। আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিচয় দাও।

৭। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট কী কারণে বিখ্যাত?

৮। মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের বাণীগুলি কী কী বল?